উপন্যাস

ভালো হতে চাই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM 2021

সূচিপত্র

১. ট্যাক্সি ধরার জন্য 2
২. ঘুম ভাঙার পর 19
৩. সুমিত্রা যে কী খেতে ভালোবাসে 29
৪. ট্যাক্সি এসে থামল 49
৫. রবিবার সকাল.. 76

১. ট্যাক্সি ধরার জন্য

ট্যাক্সি ধরার জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল অভিজিৎ। সন্ধ্যের মুখটায় ধর্মতলায় ট্যাক্সি পাওয়া খুবই শক্ত। কিন্তু অভিজিতের বাড়ি ফেরার তাড়া আছে। ট্যাক্সির বদলে প্রথম থেকেই যদি সে বাসে ওঠার চেষ্টা করত, তাহলে এতক্ষণ বোধহয় বাড়ি পৌঁছে যেত! এখন আর উপায় নেই। এখন ট্যাক্সির আশা ছেড়ে বাস ধরতে গেলে তার সত্যিই অনেক দেরি হয়ে যাবে। সাড়ে সাতটার সময় সুমিত্রাকে কল্যাণদের বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার কথা। সাড়ে সাতটা বাজতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি।

তা ছাড়া, অভিজিতের নিয়তিই বোধ হয় তাকে ওইসময় ট্যাক্সির জন্যে দাঁড় করিয়ে রেখে দিল ধর্মতলায়। একটা ট্যাক্সি খুব কাছাকাছি এসে থামল। ভেতরের লোক নামছে। অভিজিৎ দৌড়ে গেল সেদিকে।

ট্যাক্সিতে তিন জন লোক বসে ছিল, তার মধ্যে থেকে নামল মাত্র এক জন। অর্থাৎ, ট্যাক্সিটা খালি হবে না। ভেতর থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল, আরে অভিজিৎ না? কোথায় যাবি?

বাদল আর নিখিল। অভিজিতের পুরোনো বন্ধু। এর মধ্যে নিখিল থাকে বোম্বেতে, তিন চার বছর দেখা নেই।

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, তোরা কোন দিকে যাচ্ছিস?

উঠে পড়, উঠে পড়।

কোন দিকে যাচ্ছিস, বল না?

উঠে পড় না।

আমার একটা জরুরি কাজ আছে।

উঠে পড় না, পৌঁছে দেবো আমরা।

একেবারে মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রাখার নিয়ম নেই। চালক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অভিজিৎকে ট্যাক্সিতে উঠে পড়তেই হল।

তুই কবে এসেছিস নিখিল?

কাল রাত্তিরে। তোর খোঁজ করছিলাম। তুই বাড়ি বদলেছিস শুনলাম?

হ্যাঁ।

বিয়েও তো করেছিস?

অভিজিৎ ঠিক মনে করতে পারল না, নিখিলকে সে তার বিয়ের চিঠি পাঠিয়েছিল কিনা। বাদলকে অবশ্য নেমন্তন্ন করেছিল, কিন্তু সে কী জন্য যেন আসতে পারেনি।

ট্যাক্সি যাচ্ছে পার্ক স্ট্রিটের দিকে। অভিজিৎ বলল, তুই দু-একদিন থাকছিস তো নিখিল? পরে দেখা করব, আমাকে এখানে নামিয়ে দে, আমি আর একটা ট্যাক্সি ধরে নিই।

বেশ, তুই কোথায় যাবি?

আমাকে একবার মানিকতলায় যেতে হবে।

মানিকতলায় কেন?

সুমিত্রা মানে আমার স্ত্রী মানিকতলায় গেছে, কল্যাণদের বাড়িতে। ওখান থেকে ওকে সাড়ে সাতটার সময় আমার তুলে আনার কথা।

কল্যাণ কে?

কল্যাণ আমার এক পুরোনো বন্ধু, সম্পর্কে আবার সুমিত্রার একরকম ভাইও হয়। ওদের বাড়িতে আজ মেয়ে দেখার ব্যাপার আছে, সুমিত্রা সেইজন্য গেছে।

তোর স্ত্রী একা বাড়ি ফিরতে পারবেন না?

রাস্তাঘাট ঠিক ভালোমতন চেনে না।

তুই না গেলেও, কেউ-না-কেউ পৌঁছে দেবে নিশ্চয়ই।

না, না, আমি কথা দিয়েছি।

নিখিল হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বলল, আমরা তো ভাই বিয়ে করিনি, আমরা এ-রকম কথা দেওয়ার মানে বুঝি না। এত বড় একটা শহরে মেয়েরা নিজে যাতায়াত করতে পারে না মুম্বাইতে তো দেখেছি সকলে নিজেরাই ঘোরাফেরা করে।

অভিজিৎ একটু অস্বস্তি বোধ করল। কোনো উত্তর দিতে পারল না।

বাদল বলল, অভিকে তো আজকাল দেখাই যায় না। কোনো আড্ডাতেই দেখি না।

অফিসের বড্ড কাজ পড়ে গেছে। তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়ি, বাড়ি চলে যাই।

নিখিল বলল, শোন, আমি পরশুই শিলং চলে যাচ্ছি। কাল সারাদিন স্টুডিয়োতে ব্যস্ত থাকব, তাহলে তোর সঙ্গে আর দেখাই হবে না অভিজিৎ।

বাদল বলল, এক কাজ কর না। আমরা রোলাণ্ড রোডের একটা ফ্ল্যাটে যাচ্ছি, সেখানে ফোন আছে। সেখান থেকে তোর স্ত্রীকে ফোন করে দে যে তোর যেতে একটু দেরি হবে।

অভিজিৎ বলল, না রে, আজ আমি চলেই যাই। কাল-পরশু ঠিক দেখা করে নেব তোদের সঙ্গে।

নিখিল বলল, কিন্তু তোর সঙ্গে যে আমার জরুরি দরকার আছে। ফোন করে দিবি তোর বউকে, তাতে অসুবিধে কী?

অভিজিৎ ক্ষীণ গলায় বলল, ঠিক আছে, চল।

বাদল বলল, ওখানে স্কচ আছে।

আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

নিখিল খানিকটা ঠাট্টার সুরে বলল, সে কী গুরু! এসব কী কথা শুনছি?

বাদল বলল, এই নিয়ে ক-বার ছাড়লি রে?

না, এবার সত্যি ছেড়ে দিয়েছি। বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছিল, প্রত্যেকদিনই একটা-না-একটা ঝামেলা!

অত বেশি না খেলেই হয়। আমিও ঝামেলা একদম পছন্দ করি না।

তোরা কার ফ্ল্যাটে যাচ্ছিস? সেখানে আর কে কে থাকবে?

চল না। তোর কোনো অসুবিধে হবে না।

ট্যাক্সি এসে থামল পুরোনো আমলের সাহেবি কায়দার একটি বাড়ির সামনে। এখানে এলে হঠাৎ বিশ্বাসই হয় না যে, কলকাতাটা এত ভিড়ের শহর। এখানকার রাস্তাঘাট নিরালা, বাড়িগুলো ফাঁকা ফাঁকা, প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে বাগান।

লোহার গেট ও বাগান পেরিয়ে একটি চওড়া গাড়িবারান্দা। সিঁড়িতে কার্পেট। তবু ঘরের দরজায় পেতলের নেমপ্লেট দেখে বোঝা যায় এটা ফ্ল্যাটবাড়ি। তিন তলার সিঁড়ির সামনে দরজায় লেখা–আর এল চাড্ডা। নিখিল সেই দরজারই বেল বাজাল।

দরজা খুলে দিল একজন প্রৌঢ় লোক, পাজামা ও সিল্কের পাঞ্জাবিপরা। পাঞ্জাবির বোতামগুলো লাগানো নেই, তাই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বুকে একরাশ চুল। লোকটার শরীরটা চ্যাপটা ধরনের। দেখলেই বোঝা যায়, গায়ে জোর আছে। লোকটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, আপনারা অনেক দেরি করেছেন।

ঘরে ঢুকে কুশল বিনিময় ও আলাপ-পরিচয় হল। ওই লোকটিরই নাম রতনলাল চাড্ডা। উনি কাঠের ব্যবসা করেন। প্রধানত থাকেন জলপাইগুড়িতে, কলকাতায় ওঁর আলাদা নিজস্ব বাড়ি আছে। এখানে এই ফ্ল্যাটটি রেখেছেন শুধু বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য কিংবা সন্ধ্যে বেলা আমোদপ্রমোদের জন্য। লোকটির সঙ্গে বাদল আর নিখিলের যে ঠিক কী সম্পর্ক তা অভিজিৎ ঠিক বুঝতে পারল না।

দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা মস্তবড়ো বসবার ঘর। আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। দামি চামড়ায় মোড়া মোটা গদিওয়ালা সোফা ঘরের দু-জায়গায় সাজানো। রতনলাল চা খুব খাতির করে বলল, বসুন বসুন। আরাম করে বসুন। বেয়ারা–

বসবার ঘর থেকেই দেখা যায় একপাশে ছোটো একটা রান্নাঘর। সেখান থেকে একজন উর্দিপরা বেয়ারা বেরিয়ে এল।

গ্লাস আর সোডা লাও। আউর কুছ খানা

টেবিলের তলা থেকে স্কচের বোতল বার করল রতনলাল। তারপর নিখিলকে জিজ্ঞেস করল, বলুন, বাবুভায়ের খবর বলুন।

নিখিল পরে আছে একটা গাঢ় নীল রঙের স্যুট। সে বরাবরই ফিটফাট সেজে থাকতে ভালোবাসে। এখন বোম্বাইতে থাকার ফলে তার সাজপোশাকের চাকচিক্য আরও বেড়েছে। এক সময় অভিজিতের সঙ্গে কলেজে পড়ত নিখিল। ছাত্র হিসেবে খুব ভালো ছিল, এখন বোম্বাইতে একটা টুথপেস্ট কোম্পানিতে বড়ো কাজ করে। বাদল কাজকর্ম বিশেষ কিছু করে না। তবু অবস্থা বেশ সচ্ছল। ওদের কী যেন একটা পারিবারিক ব্যবসা

আছে। তা নিয়ে বাদলকে কখনো মাথা ঘামাতে দেখা যায় না, কিন্তু ওর পকেটে বেশ টাকা থাকে।

নিখিল কোটের ভেতরের পকেট থেকে সাবধানে একটা খাম বার করে বলল, বাবুভাই আপনাকে কিছু কাগজপত্র পাঠিয়েছে।

রতনলাল খামটা পকেটে ভরে বলল, ঠিক আছে, এনিয়ে আপনার সঙ্গে পরে কথা বলব। বাবুভাই কি এখন মুম্বাইতেই থাকছেন না কোচিন চলে যাবেন?

নিখিল বলল, বাবুভাই এখন কিছুদিন একটা নার্সিংহোমে থাকবেন।

তারপর কিছুক্ষণ ধরে নিখিল আর রতনলালের মধ্যে বাবুভাই নামে কোনো একটা রহস্যময় লোক সম্পর্কে আলোচনা চলল।

অভিজিৎ উশখুশ করতে লাগল। সুমিত্রাকে টেলিফোন করা হচ্ছে না। ওরা ভুলে গেছে। এসব ঘরে কোনো টেলিফোন দেখা যাচ্ছে না।

সে বাদলকে ইঙ্গিত করল।

বাদল বলল, ও হ্যাঁ, এই যে রতনলালজি, আমার বন্ধু একটু আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করবেন।

রতনলাল বলল, চলে যান না, ওই ঘরের মধ্যে চলে যান

পর্দা সরিয়ে অভিজিৎ পাশের একটা ঘরে ঢুকল। ঘরটায় একটা খাট পাতা-তার ওপরে অনেকগুলো জামাকাপড়ের বাক্স। নতুন সুতো দিয়ে বাঁধা। হঠাৎ এতগুলো জামাকাপড় কেন এখানে কিনে রাখা হয়েছে কে জানে। হয়তো রতনলালের বাড়িতে কোনো বিয়ে আছে।

ঘরের কোণে ছোট্ট একটা শ্বেতপাথরের ওপর টেলিফোন। কল্যাণদের বাড়ির নম্বরটা অভিজিতের মুখস্থই আছে। কিন্তু লাইন পেল না। এনগেজড। একটুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

অভিজিৎ দাঁড়িয়ে রইল। ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। দুটো স্টিলের আলমারি তালাবন্ধ। দেয়ালে একটা অসমিয়া ভাষার ক্যালেণ্ডার। চাড্ডারা কোথাকার লোক? নাম শুনে তো মনে হয় মাড়োয়ারি।

লোকটা বেশিরভাগ সময়ই থাকে জলপাইগুড়ি। কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে সন্ধ্যে বেলা কয়েক ঘণ্টার জন্যে এখানে আসে। তারজন্যেই এত বড়ো একটা ফ্ল্যাট রাখা আছে। আবার একজন আর্দালি। অথচ কলকাতার কত লোক থাকার জায়গা পায় না। এ-রকম একটা ফ্ল্যাট যদি অভিজিৎ পেত!-না, পোষাতে পারত না, নিশ্চয়ই প্রচুর ভাড়া!

অভিজিৎ আবার টেলিফোনে চেষ্টা করল। আবার লাইন এনগেজড। পর পর চার বার চেষ্টা করেও কল্যাণদের বাড়ির লাইন পাওয়া গেল না। ধুৎ! কতক্ষণ আর এ-রকম ফাঁকা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। তার থেকে বরং এবার চলে যাওয়াই ভালো। আটটা বেজে গেছে। টেলিফোনের ওপর নির্ভর করাটাই তার ভুল হয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই নিখিল বলল, কী রে, এতক্ষণ ধরে বউয়ের সঙ্গে গল্প করছিলি?

লাইনই পাইনি!

এতক্ষণ ধরে লাইন এনগেজড!

রতনলাল ইতিমধ্যে চারটে গেলাসে হুইস্কি ঢেলেছে। একটা গেলাস অভিজিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন, আপনার জন্যে শুরু করতে পারছি না।

অভিজিৎ সংকুচিতভাবে বলল, না, না, আপনারা শুরু করুন, আমার লাগবে না।

আপনি খাবেন না?

আমি মদ খাই না।

রতনলাল বিস্মিতভাবে নিখিলের দিকে তাকাল। তার ভাবখানা এই, যে মদ খায় না, তাকে এখানে আনার কী মানে হয়? এটা কি নিরামিষ জায়গা?

নিখিল অভিজিৎকে এক ধমক দিয়ে বলল, নে, কী ইয়ার্কি করছিস? জানেন রতনলালজি, আমার এই বন্ধু, এই অভিজিৎই আমাকে মদ খাওয়া শিখিয়েছে। তাও কোথায়! গ্র্যাণ্ড হোটেলে! আমি প্রথম মদ খাই গ্র্যাণ্ড হোটেলে।

তা আপনার বন্ধু আপনাকে শিখিয়ে এখন নিজেই সরে পড়ছেন।

ওসব ওর বাজেকথা। নিশ্চয়ই কাল বেশি খেয়েছে-তাই আজ একটু বৈরাগ্য এসেছে! নে অভিজিৎ!

না রে! তা ছাড়া আমাকে এখন যেতে হবে। টেলিফোনও করতে পারলাম না।

একটু বাদে আবার চেষ্টা করবি।

না। চলেই যাই।

অনেকেই বিয়ে করে-কিন্তু তোর মতন এমন বউ-বাতিকগ্রস্ত তো আর কারুকে দেখিনি! বউকে ভয় পাস বুঝি?

বাদল বলল, অভিজিৎ, তোর বউ বুঝি মদ খাওয়া একদম পছন্দ করে না? তুই বিয়ের আগে বলে নিসনি?

রতনলাল বেশ শব্দ করে হেসে উঠল।

বউয়ের প্রসঙ্গ তুলে খোঁচা মারলে পুরুষমানুষের আত্মাভিমানে লাগে। তা ছাড়া একটু যেন বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মাত্র কিছুদিন আগেও অন্য কেউ এ- রকম আড্ডা ছেড়ে উঠে চলে যেতে চাইলে অভিজিৎই তাকে ঠাট্টা করত।

সে বসে পড়ে গেলাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুক দিল।

সঙ্গে সঙ্গে যেন তার বুকটা জুড়িয়ে গেল। বুকটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল একেবারে। আট দিন হল, অভিজিৎ এক ফোঁটাও খায়নি। প্রতিজ্ঞা করে ছেড়ে দিয়েছিল।

অভিজিতের একটু একটু ভয় করতে লাগল। প্রতিজ্ঞা রাখতে পারল না। সুমিত্রাকে কী বলে বোঝাবে! যাক, খুব কম করে খেলেই হবে। এই এক গেলাস, ব্যস!

অভিজিৎ বাদলের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। সে সিগারেটও ছেড়ে দিয়েছিল।

নিখিল বলল, তুই এখনও মুখ গোমড়া করে আছিস কেন?

বাদল বলল, অন্তত তিন পেগ না খেলে অভিজিতের মেজাজই খোলে না। বার বার দেখেছি।

অভিজিৎ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, না না–

তুই টেলিফোনটা করতে পারিসনি বলে মনটা খচখচ করছে তো? দে নম্বরটা আমাকে দে! আমি লাইন ধরে দিচ্ছি, কিংবা আমিই বলে দিচ্ছি তোর বউকে–এই সুযোগে আলাপও হয়ে যাবে। তোর বউকে আমার নাম-টাম বলেছিস তো? আমাকে চিনতে পারবে তো?

অভিজিৎ হেসে বলল, তা পারবে।

নম্বরটা জেনে নিয়ে নিখিল চলে গেল পাশের ঘরে।

রতনলাল বলল, নিখিলজির মুখে শুনলাম, আপনি পাবলিসিটি ফার্মে আছেন?

হ্যাঁ।

কোন ফার্ম? কী নাম?

বেঙ্গল ন্যাশনাল।

ফার্ম আপনার নিজের?

না। আমি চাকরি করি, ম্যানেজার!

আপনাকে আমাদের কাজে লাগবে। আমরা শিগগিরই একটা বিয়ার ফ্যাক্টরি খুলছি শিলং এ। পাবলিসিটি ক্যাম্পেন হবে। আপনি যদি এর ভার নিতে পারেন

অভিজিৎ সচকিত হয়ে উঠল। এ তো দারুণ প্রস্তাব। নতুন বিয়ার ফ্যাক্টরির পাবলিসিটি তো বেশ বড়ো কাজ। এ কাজ জোগাড় করতে পারলে তার কোম্পানির মালিক খুব খুশি হবে। সে নিজেও কমিশনের একটা পার্সেন্টেজ পাবে। অনেক টাকার ব্যাপার।

রতনলাল বলল, ফাইনান্স কিছু আসবে মুম্বাই থেকে। মেঘালয়ে প্রোজেক্ট স্যাংশান হয়ে গেছে। খুব শিগগিরই কাজ শুরু হবে–

অভিজিৎ উৎসাহের সঙ্গে বলল, এ ব্যাপারে আমাদের খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে। আমরা শ-ওয়ালেসের কিছু কাজ করেছি।

গেলাসের পানীয় ফুরিয়ে গিয়েছিল, রতনলাল আবার ঢেলে দিল। অভিজিৎ বাধা দিল না।

নিখিল ফিরল বেশ দেরি করে। ফিরে এসে সে রতনলালকে বলল, মি. রাওকে খবর দিয়ে দিয়েছি। আর শিলং-এ ট্র্যাঙ্কও বুক করে ফেলেছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে পাওয়া যাবে।

অভিজিৎ ভাবল, নিখিল কি তার টেলিফোনটার কথা ভুলে গেছে নাকি? আচ্ছা দায়িত্বজ্ঞানহীন তো!

নিখিল তার দিকে ফিরে বলল, অভিজিৎ, তোর লাইন কিছুতেই পাওয়া গেল না। অপারেটার বলল, ও লাইন আউট অব অর্ডার।

তার মানে সুমিত্রাকে খবর দেওয়ার কোনো উপায় নেই। তাহলে আর দেরি করা যায় না, এক্ষুনি উঠতে হয়। কিন্তু রতনলাল এত বড়ো একটা কনট্রাক্টের কথা বলল, এটা সম্পর্কে কিছু পাকাপাকি না করে চলে যাওয়া যায়? সুমিত্রা না হয় খানিকটা অপেক্ষা করবে। যদি সে নিজেই বুদ্ধি করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসে-রাস্তা চেনার দরকার কী? ট্যাক্সিওয়ালাকে বাড়ির ঠিকানা বলে দিলেই তো হয়।

পুরুষমানুষের বাইরে অনেকরকম কাজকর্ম থাকে। মেয়েদের এটা বোঝা উচিত। এত বড়ো একটা কাজের তুলনায় বউকে ঠিক সময়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা মোটেই বড়ো কথা নয়। আর এইসব কাজের জন্য অনেক বড়ো বড়ো মহলে ঘুরতে হয়। সেখানে একটু-আধটু মদ না খেয়ে উপায় নেই। সুমিত্রা এইটুকু বুঝবে না।

এত বড়ো কাজের ব্যাপার, দু-চার কথায় শেষ হয় না। মধ্যে মধ্যে আবার নিখিল অন্য কথা পেড়ে বসছে। নিখিলের কথা শুনে মনে হয় সে এখন খুব বড়ো বড়ো মহলে ঘুরছে। অনেক টাকার কোনো কারবারে জড়িত।

অভিজিতের যখন তিন পেগ শেষ হয়েছে, সেই সময় একটি মেয়ে এসে হাজির হল।

অভিজিৎ খুব একটা অবাক হল না। এরকম সুসজ্জিত ফাঁকা ফ্ল্যাট যখন, তখন এর সঙ্গে কোনো-না-কোনো মেয়ে জড়িত থাকবেই। কলকাতায় মেয়ে পাওয়া অনেক সোজা, এ-রকম জায়গা পাওয়াই শক্ত।

মেয়েটি একটি কমলা রঙের শাড়ি পরেছে। মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা, ঠোঁটে অনেকখানি রং। বয়েস মনে হয় বাইশ-তেইশের বেশি নয়। ঠিক সুন্দরী বলা যায় না, তবে রূপের একটা চটক আছে। রতনলাল উঠে দাঁড়িয়ে তাকে খাতির করে এনে বসাল। আলাপ করিয়ে দিল সকলের সঙ্গে। মেয়েটির নাম শেলি দত্ত। শুনলেই বোঝা যায়, ওটা ওর আসল নাম নয়। মেয়েদের নাম কেন শেলি রাখা হয়? একজন বড়ো কবির অপমান।

প্রসঙ্গটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা করল অভিজিৎ। কিন্তু রতনলাল আর মন দিতে চাইছে না। মেয়েটির দিকেই তার বেশি মনোযোগ। মাঝে মাঝে রতনলাল মেয়েটির ঊরুর ওপর হাত রাখছে, যেন কিছুই ব্যাপার নয়। কেউ তাকাচ্ছে না সে-দিকে। বাদল আর নিখিল এতক্ষণ রতনলালের সঙ্গে খুব খাতির করে কথা বলছিল। এখন মেয়েটিকেও খাতির করতে লাগল। মেয়েটিও হুইস্কি খাচ্ছে। এক বোতল শেষ হয়েছে, আর-এক বোতল বেরিয়েছে! অভিজিতের পাঁচ পেগ হয়ে গেছে, এখন রাত দশটা!

অভিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি চলি।

মেয়েটি বলল, এ কী, আমি এলাম আর অমনি আপনি চলে যাচ্ছেন?

অভিজিৎ কটমট করে মেয়েটির দিকে তাকাল। এসব মেয়েদের সে দু-চক্ষে দেখতে পারে। না। যে মেয়ের ঊরুতে অন্য লোকেরা হাত দেয়।

নিখিল বলল, দাঁড়া, আমরা একটু পরেই যাব।

না, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

রতনলাল বলল, ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে পরে আবার কথা হবে।

কবে আপনার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করব বলুন। কাল?

না, কাল হবে না। আমি ব্যস্ত থাকব। ঠিক আছে, নিখিলবাবু আগে শিলং থেকে ঘুরে আসুক, তারপর বাকি কথা হবে।

অভিজিৎ নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

শরীরে বেশ একটা চনমনে ভাব। সিঁড়ি দিয়ে নামল জুতোর টকটক শব্দ করে। রাস্তায় বেরিয়ে আপনমনে শিস দিতে লাগল আস্তে আস্তে। একটা বড়ো কাজের সন্ধান পাওয়া গেছে, অফিসে সবাই খুশি হবে। ইদানীং অফিসের অবস্থা বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। হাঁটতে বেশ ভালো লাগছে অভিজিতের। হালকা লাগছে মাথাটা।

বড়ো রাস্তাতেও দু-একবার চেষ্টা করে ট্যাক্সি ধরা গেল না। কত রাত বেড়ে যাচ্ছে, সুমিত্রা এতক্ষণ কী করছে কে জানে?

কোনো একটা হোটেলের বা বারের সামনে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। এই ভেবে অভিজিৎ সেই দিকে এগোল। সত্যিই তাই, একটি বারের সামনে অনেকগুলো ট্যাক্সি দাঁড়ানো।

কিন্তু কোনো একটাতে উঠতে গিয়েও তার একটা সমস্যা দেখা দিল। এখন সে কোথায় যাবে? সুমিত্রা কি দশটা পর্যন্ত সেই মানিকতলাতেই বসে আছে? যদি না থাকে? এমনও হতে পারে, সুমিত্রা অন্য কারুর সঙ্গে বাড়ি চলে এসেছে। কিংবা নিজেই ট্যাক্সি নিয়ে। তাহলে অভিজিতের এখন বাড়িতেই ফেরা উচিত।

আবার যদি বাড়িতে গিয়ে দেখে সুমিত্রা ফেরেনি? সে যদি বোকার মতন অভিজিতের কথার ওপর ভরসা করে সেই মানিকতলাতেই বসে থাকে তাহলে অভিজিৎকে বাড়ি থেকে আবার মানিকতলায় ছুটতে হবে। সম্পূর্ণ উলটো রাস্তা। তার বাড়ি হাজরার কাছে। ট্যাক্সিতে উলটে অতখানি যেতে গেলে ভাড়াও তো কম লাগবে না।

কোথায় আগে যাবে অভিজিৎ কিছুতেই ঠিক করতে পারল না। সেইজন্যেই সে সামনের বারটায় ঢুকে পড়ল। গলাটা আবার শুকিয়ে এসেছে। আর একবার ভিজিয়ে নেওয়া দরকার। ভেতরে গিয়ে সে আর বসবে না। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে এক পেগ খেয়েই চলে যাবে।

পেগের অর্ডার দিতেই দূরের টেবিল থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ডাকল–অভিজিৎ।

অভিজিৎ না-শোনার ভান করল। তার আড্ডায় জমে গেলে চলবে না। এক পেগ খেয়েই চলে যেতে হবে। সুমিত্রা কি মানিকতলায় এখনও বসে আছে? যদি নিজেই বুদ্ধি করে বাড়ি চলে আসে

পেছন থেকে একজন এসে অভিজিতের কাঁধে চাপড়া মারল। তারপর বলল, কী রে শালা, ডাকছি, শুনতে পাচ্ছিস না?

অভিজিৎ মুখ ফেরাল। প্রিয়ব্রত। একমুখ ভরতি দাড়ি, বিশাল চেহারা। এরমধ্যেই নেশায় চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

প্রিয়ব্রত একজন শিল্পী। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অভিজিৎদের অফিসেই চাকরি করত। কিছুদিন আগে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। প্রিয়ব্রতর মনটা শিশুর মতন, কিন্তু বড় বদমেজাজি।

এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? আয়, আমার টেবিলে আয়।

অভিজিৎ অনুনয় করে বলল, না রে, আজ আর বসব না। এক্ষুনি চলে যেতে হবে।

এরমধ্যেই!

হ্যাঁ রে, জরুরি কাজ আছে।

রাত দশটায় জরুরি কাজ? আঃ হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা-প্রিয়ব্রত প্রচন্ড জোরে হাসে। একবার শুরু করলে সহজে থামতে চায় না। এখন মাতালের হাসি। আরও জোরালো। অন্য টেবিল থেকে সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখতে লাগল।

প্রিয়ব্রত জোর করে অভিজিতের হাত ধরে টেনে বলল, আয়, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।

না রে, আজ না, আর-একদিন।

হঠাৎ অভিজিতের হাত ছেড়ে দিয়ে প্রিয়ব্রত নরম গলায় বলল, আসবি না? তুই আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিস?

প্রিয়ব্রতর অভিমান হয়েছে। ওর স্বভাবই এইরকম। কখন যে রাগ হয়, কখন অভিমান, তা বোঝাই যায় না।

অভিজিৎ মুশকিলে পড়ল। প্রিয়ব্রতকে এখন কিছুতেই বোঝানো যাবে না। ও ভাবছে, ও অফিসে ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে দিয়েছে বলেই অভিজিৎ ওকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। তা কখনো হয়? ঝগড়া তো হয়েছে মালিকের সঙ্গে। অভিজিৎ তো আর মালিক নয়, সে একটু বেশি উঁচু চাকরি করে-এইমাত্র। প্রিয়ব্রতর সঙ্গে ওর অনেক দিনের পরিচয়, তার সঙ্গে অফিসের কী সম্পর্ক আছে? কিন্তু আজ যে অভিজিতের সত্যিই আর দেরি করা উচিত নয়, সেটা কী করে বোঝাবে? এখানে হঠাৎ ঢুকে পড়াটাই ভুল হয়েছে। যদি এখুনি ট্যাক্সি নিয়ে

অভিজিৎকে প্রিয়ব্রতের টেবিলে এসে বসতেই হল। সেখানে আরও দু-জন রয়েছে, অভিজিতের সামান্য মুখ-চেনা।

প্রিয়ব্রত হাঁক পাড়ল, বেয়ারা, পেগ আনো।

তারপর সে অভিজিতের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, আমি নিজেই একটা ফার্ম খুলেছি, নিজে ব্যবসা করব। কোনো শালার চাকরি করব না আর এ জীবনে। তাতে মরি আর বাঁচি।

অভিজিৎ বলল, সে তো খুব ভালো কথা।

তুই আসবি আমার সঙ্গে? তোর অভিজ্ঞতাটা যদি কাজে লাগানো যায়–

অভিজিৎ চট করে কোনো উত্তর দিতে পারল না। সব জায়গাতেই আজকাল দারুণ প্রতিযোগিতা। নতুন কোনো কোম্পানির পক্ষে টিকে থাকা খুব শক্ত। অভিজিৎ ভালো কোম্পানিতে কাজ করে, যথেষ্ট মাইনে পায়। সে চাকরি ছেড়ে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া কি চট করে সম্ভব?

প্রিয়ব্রত বলল, তুই আমার সঙ্গে যদি আসিস, ফিফটি ফিফটি পার্টনারশিপ, দু-জনে লড়ে যাব, মরি বাঁচি যা হয়। তবু একটা সান্ত্বনা থাকবে, নিজের ইচ্ছেতেই যা কিছু করেছি। চাকরির থেকে অনেক ভালো।

অভিজিৎ সতর্কভাবে বলল, নতুন কোম্পানি খোলা কী সহজ কথা! অফিসঘর লাগবে, প্রথমে অনেক টাকা ঢালতে হবে।

সেসব ব্যবস্থা আমি করব, আর কিছু না, গোড়ার দিকেই যদি এই দেড় দু-লাখ টাকার কাজ ধরতে পারা যায়, তাহলেই কোম্পানি দাঁড়িয়ে যাবে।

অভিজিতের মনে পড়ল, একটু আগেই সে এ-রকম একটা বড় কাজের সন্ধান পেয়েছে। রতনলাল চাড্ডার কাজটা দেড়-দু লাখের বেশিই হবে হয়তো। সেই কাজটা প্রিয়ব্রতকে যদি পাইয়ে দেওয়া যায় তাহলেই ওর সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু অভিজিৎ মুখে কিছু বলল না। অত বড়ো একটা কাজ নিয়ে ছেলেমানুষি করা উচিত নয়। কাজটা তার নিজের অফিসকে পাইয়ে দিলে সেখানে তার অনেক সুনাম হবে, নিজে অনেক টাকার কমিশন পাবে। প্রিয়ব্রতর ওপর ভরসা কী!

একটু বাদে তার খেয়াল হল, এই টেবিলে এসে তার আরও দু-পেগ খাওয়া হয়ে গেছে। প্রিয়ব্রত তাকে খাওয়াচ্ছে। প্রিয়ব্রত কেন তাকে খাওয়াচ্ছে? প্রিয়ব্রত এখন বেকার, সে এত পয়সা খরচ করছে কেন? সারাসন্ধ্যে অভিজিতের নিজের প্রায় কিছুই খরচ হয়নি। সবাই কি তাকে কৃপণ ভাবছে? অ্যাঁ, অভিজিৎ সেনগুপ্ত কৃপণ? পয়সা তার কাছে খোলামকুচি!

অভিজিৎ চিৎকার করে বলল, বেয়ারা, পেগ লাও! টেবিলের সব্বাইকে।

তারপর সে টেবিলে এক ঘুসি মেরে প্রিয়ব্রতকে বলল, তুই কি ভাবছিস, আমি চাকরির পরোয়া করি? আমি তোর সঙ্গে আছি প্রিয়ব্রত। তুই যা-করবি, আমি তোকে সাহায্য করব।

তুই আসবি আমার সঙ্গে?

আলবাত।

দু-জনে মিলে যদি খাটি, কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। পাবিলিসিটি লাইনে তোর অনেক অভিজ্ঞতা, আমারও খানিকটা নাম-টাম আছে।

দেখ-না, বেশি খাটতেও হবে না। আমি এত বড়ো একটা কাজ জোগাড় করে আনব প্রথমেই।

এক চুমুকে পেগটা শেষ করে অভিজিৎ তীব্রভাবে তাকিয়ে রইল। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। আবার সে হাঁক দিল, বেয়ারা। আর-এক রাউন্ড!

প্রিয়ব্রত বলল, আর খাসনি। চল এবার

অভিজিৎ তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, বোস। আলবাত আরও খাব! কত খেতে চাস! আমার কাছে অনেক টাকা আছে...

২. ঘুম ভাঙার পর

ঘুম ভাঙার পরই অভিজিৎ ধড়মড় করে উঠে বসল! সে কোথায়? নিজেরই তো ঘর, নিজের বিছানা। কাল রাত্রে সে কখন বাড়ি ফিরল? কে পৌঁছে দিল? কিছুই মনে নেই।

নিজের শরীরের দিকে তাকাল। পাজামা আর গেঞ্জি পরে আছে। তার শার্ট প্যান্ট তো অন্য কেউ খুলে দেয়নি, সে নিজেই খুলেছে নিশ্চয়ই। জুতোও খুলেছে, কিন্তু মোজা খোলা হয়নি। কখন বাড়ি ফিরল সে? সুমিত্রা কোথায়? ঘরে সুমিত্রা নেই। অভিজিতের একটু একটু মনে পড়ল যে, কাল সন্ধ্যে বেলা মানিকতলা থেকে সুমিত্রাকে তার নিয়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু সে যায়নি। কখন সে নিজে বাড়ি ফিরেছে কিছু মনে নেই। সুমিত্রা কি রাত্রে ফেরেনি?

ঠিক তক্ষুনি সুমিত্রা ঘরে ঢুকল। সকাল বেলাতেই স্নান করে নিয়েছে। পিঠের ওপর ভিজে চুল মেলা। একটা চওড়াপাড় শাড়ি পরা। মুখখানা গম্ভীর।

অভিজিৎ মনে মনে দারুণ অপরাধী হয়ে আছে। অনুশোচনায় বুক পুড়ে যাচ্ছে। এখন সে সুমিত্রার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতেও রাজি। কিন্তু প্রথমে কথাটা কীভাবে শুরু করবে, তাই ভেবে পাচ্ছে না।

সুমিত্রা একটাও কথা না-বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অভিজিতের মাথাটা ধরে আছে। দারুণ জলতেষ্টা পেয়েছে। সাধারণত মাথার কাছে ছোটো টেবিলে একটা জলের জাগ আর গেলাস থাকে, আজ নেই। কী কী হল কাল রাত্রে? নিখিল আর বাদল তাকে ধরে নিয়ে গেল একটা ফ্ল্যাটে। সেখানে একটা লোক-কী যেন নাম? দুরছাই নামটা মনে পড়ছে না। যাক গে, সেই লোকটা একটা বড়ো কাজের প্রস্তাব দিয়েছিল...তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিটে একটা বারে। কেন অভিজিৎ সেখানে ঢুকেছিল? সুমিত্রাকে আনতে না গিয়ে, সে কেন নিজেই একটা বারে ঢুকে পড়েছিল? মনে

পড়ছে না...সেখানে কার সঙ্গে যেন দেখা হল? খুব চেনা একজন-অথচ মুখটা মনে নেই গলার আওয়াজটাও, প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা হয়েছিল-তারপর? মনে নেই, আর কিছু মনে নেই।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সে প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করল! ভেতরে তিনটে টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা পড়ে আছে। কাল তার পকেটে প্রায় নব্বই টাকা ছিল, অফিসে একটা এক-শো টাকার নোট ভাঙিয়েছিল মনে আছে, তা হলে এতগুলো টাকা কোথায় গেল! পার্ক স্ট্রিটের বার থেকে বেরিয়ে আর কোথাও যাওয়া হয়েছিল? প্রিয়ব্রতর সঙ্গে আবার দেখা না হলে কিছুই জানা যাবে না।

সুমিত্রা এক কাপ চা এনে মাথার কাছে ছোটো টেবিলটায় রাখল।

অভিজিৎ বলল, আগে এক গেলাস জল দাও তো, আর মাথা ধরার কোনো ট্যাবলেট যদি থাকে

কথাটা বলেই সে বুঝল যে, সে ভুল করেছে। আগেই সুমিত্রার কাছে ক্ষমা না চেয়ে সে হুকুম করছে। আগেই কি সুমিত্রার হাত জড়িয়ে ধরে মিষ্টি সুরে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত ছিল না?

সুমিত্রা এক গেলাস জল আর দুটো ট্যাবলেট এনে রাখল। তখন অভিজিৎ লক্ষ করল, সুমিত্রার ডান হাতের কড়ে আঙুলে একটা ছোট্ট ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

তোমার আঙুলে কী হয়েছে?

সুমিত্রা উত্তর দিল না।

তুমি কাল কার সঙ্গে এলে?

সুমিত্রা তবুও চুপ করে রইল।

তুমি কি কাল একলাই চলে এলে নাকি? চিনতে পারলে?

এবার সুমিত্রা বলল, স্নান করার জন্যে গরম জল লাগবে?

সুমিত্রার গলার আওয়াজ শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে অভিজিৎ বলল, না, এক্ষুনি স্নান করব কী, একটু পরে! শোনো, কালকে একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে। এক পার্টি একটা খুব বড়ো কাজ...

সুমিত্রা সবটা না-শুনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অভিজিৎ একটু আহত বোধ করল। কথার মাঝখানে কেউ উঠে গেলে তার একটুও ভালো লাগে না।

সুমিত্রা তক্ষুনি কিন্তু ফিরে এল।

অভিজিৎ একটু কড়া গলায় বলল, কথাটা না-শুনেই চলে গেলে যে!

সুমিত্রার মুখে কোনো রেখা নেই। রাগ বা অভিমান কিছুরই যেন চিহ্ন নেই। খুব শান্তভাবে সে বলল, গ্যাসের উনুনে স্নানের জল চাপানো ছিল, সেটা বন্ধ করে দিয়ে এলাম।

স্নানের জল এক্ষুনি কী?

সাড়ে নটা বাজে।

অভিজিৎ দারুণ চমকে উঠল। সাড়ে নটা? কী সর্বনাশ। ঠিক দশটার সময় তার অফিসে পৌঁছোনোর কথা। সকাল থেকে পর পর অনেকগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে আছে। এমনই অফিস যে কাজে ফাঁকি মারার উপায় নেই। বাইরে থেকে লোকেরা এসে বসে থাকবে।

এক চুমুকে চা-টা শেষ করে অভিজিৎ তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে বলল, শিগগির স্নানের জল দাও। আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে।

খাট থেকে নামতেই অভিজিৎ বুঝল, তার পা টলে যাচ্ছে, মাথাটা ঘুরছে। শরীর অসম্ভব খারাপ লাগছে। কিন্তু সুমিত্রাকে তা বুঝতে দেওয়া চলে না। অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে সে ছুটে গেল দাড়ি কামাতে।

প্রাতঃকৃত্য সারবার পর অভিজিৎ দেখল স্নানের জল তৈরি। বাথরুমে তার গেঞ্জি ও শুকনো তোয়ালে ঝুলছে। সুমিত্রার কোনো কাজে ভুল হয় না।

ঝুপঝাপ করে মাথায় খানিকটা জল ঢেলেই বেরিয়ে এল অভিজিৎ! প্রায় দৌড়ঝাঁপ করেই পোশাক পরে নিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধতে বাঁধতেই চাকরের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ল, সনাতন, একটা ট্যাক্সি ডাক

শোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে সামনেই খাওয়ার জায়গা। টেবিলের ওপর অভিজিতের খাবারের প্লেট সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুমিত্রা।

আমি আজ খাব না। আমার খাওয়ার সময় নেই।

সুমিত্রা কোনো কথা বলল না। বুড়িমা নামে যে স্ত্রীলোকটি রান্না করে, সে বলল, একটু খেয়ে যাও দাদাবাবু কতক্ষণ আর লাগবে।

না না, আমার একটুও সময় নেই। তবু প্লেট থেকে একটা মাছভাজা তুলে নিল অভিজিৎ।

সুমিত্রাকে বলল, চললাম।

মাছভাজাটা খেতে খেতেই সিঁড়ি দিয়ে দৌড়োল। দশটা বাজতে দশ। অসম্ভব দেরি হয়ে যাবে। এখান থেকে ট্যাক্সি পাওয়ার আশা কম। মোড়ের মাথায় শেয়ারের ট্যাক্সি পাওয়া যায় এইসময়। সব মিলিয়ে আধ ঘণ্টা তো লাগবেই। ভিলাই থেকে ওদের পি. আর. ও. এসে বসে থাকবে। যদি লোকটা চটে গিয়ে উঠে চলে যায় তাহলে সর্বনাশ!

মাছভাজাটা শেষ করে, রুমাল দিয়ে হাতের তেল মুছে, অভিজিৎ বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। চিন্তা করল দু-এক মুহূর্ত। সে যেন, শুনতে পাচ্ছে একটা কিছু শব্দ। যদিও রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো বিশেষ শব্দই নেই।

অভিজিৎ আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে! দ্রুত পদক্ষেপে নয়, আস্তে আস্তে! শোয়ার ঘরের খাটের ওপর বসে আছে সুমিত্রা। অভিজিৎকে দেখে একবারমাত্র তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

সুমিত্রা নিঃশব্দে কাঁদছে। গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে দু-টি জলের রেখা। তবু অভিজিৎকে দেখে সে কান্না লুকোতে চাইল।

অভিজিৎ বলল, না। আমি কিছু নিতে ভুলে যায়নি।

কাছে এসে সুমিত্রার পাশে বসে পড়ে বলল, জানি, তুমি খুব রাগ করেছ। আমি খুবই অন্যায় করেছি কাল

সুমিত্রা ঠাণ্ডাভাবে বলল, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

হোক দেরি! শোনো, কাল হঠাৎ আটকে গেলাম, একটা খুব বড়ো কাজের অর্ডার পাওয়ার চান্স আছে। সে নিয়ে কথা বলতে গিয়েই

কাজের কথা বলতে গেলে বুঝি অজ্ঞান হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়?

মোটেই আমি অজ্ঞান হয়ে ফিরিনি। নিজেই আমি জামাপ্যান্ট বদলেছি...মানে, কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল, তোমাকে আনতে যেতে পারলাম না, তুমি কী করে এলে?

এসেছি তো শেষ পর্যন্ত।

তোমার আঙুলটা কাটল কী করে?

তোমার অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আছে বলছিলে–

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অভিজিৎ উঠে দাঁড়াল। সত্যিই আর দেরি করার উপায় নেই। সুমিত্রার কাঁধে হাত রেখে অভিজিৎ গাঢ় গলায় বলল, সুমিত্রা, আমি ক্ষমা চাইছি! সত্যি, আমি এ-রকম চাইনি!

অভিজিৎ ক্ষমা কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। অভিজিৎ তার মুখখানা দু-হাতের মধ্যে রেখে ব্যাকুলভাবে বলল, কেঁদো না, লক্ষ্মীটি। আমি কথা দিচ্ছি আর কক্ষনো এ রকম–

না, তোমাকে কথা দিতে হবে না।

সত্যি, বিশ্বাস করো।

আমি কতবার বিশ্বাস করব? কতবার তুমি কথা দেবে?

সুমিত্রা, আমি এবার নিজেকে বদলাব। শুধু তোমার জন্যে। এমন ঝামেলার মধ্যে পড়ে যেতে হয় অথচ আমি চাই তোমাকে খুশি করতে।

তুমি এখন যাও।

যাচ্ছি। আজ রাত্রে এসে কথা হবে।

অভিজিৎ এবার বাড়ি থেকে বেরিয়েই সৌভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। অফিস থেকে গাড়ি কেনার জন্যে ধার দেবে বলছে। এবার একটা গাড়ি কিনে ফেলতে পারলেই হয়। গাড়ি থাকলে আর ঠিক সময় বাড়ি ফেরার কোনো অসুবিধে থাকে না।

অফিসে এসেই অভিজিৎ কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে গেল। অনবরত টেলিফোন, অনবরত লোক, এক মিনিট নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। মাথাটা এখনও ধরে আছে।

সেইজন্য ঘন ঘন কালো কফি খাচ্ছে। সেই এক টুকরো মাছভাজা ছাড়া পেটে আর কোনো খাদ্যই পড়েনি। কাল রাত্তিরেও নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া হয়নি।

অফিসের অন্যান্য লোকজনরা লাঞ্চে বেরিয়ে গেছে। অভিজিৎ এখনও সময় করতে পারছে না। দোকানে গিয়ে আর লাঞ্চ খাওয়া হবে না তার। বেয়ারাকে দিয়ে কিছু আনিয়ে নিতে হবে। সত্যি খুব খিদে পাচ্ছে। পেটে খিদের জ্বালা টের পেলে অভিজিতের বেশ আনন্দ হয়। খিদে পাওয়া মানেই লিভারটা এখনও ঠিক আছে।

দেড়টার সময় টেলিফোন করল কল্যাণ। কাল ওদের বাড়িতেই গিয়েছিল সুমিত্রা। টেলিফোনটা ধরেই রাগ হয়ে গেল অভিজিতের। এই টেলিফোনটাই তো যত নষ্টের গোড়া।

কল্যাণ জিজ্ঞেস করল, কী শরীর কেমন আছে আজ?

অভিজিৎ ব্যঙ্গের সুরে বলল, আমার শরীর কোনোদিনই খারাপ থাকে না। কিন্তু তোমাদের টেলিফোনের শরীর ভালো হয়ে গেছে দেখছি।

তার মানে?

কাল সন্ধ্যে বেলা অন্তত দশ বার তোমাদের বাড়িতে একটা টেলিফোন করার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই পাইনি।

এ-রকম তো হয়ই। এ আর নতুন কী? কাল রাতে তুমি কী করলে বলো তো?

কী আবার করব, জরুরি কাজে আটকে পড়েছিলাম।

তা বলে রাত একটার সময়

অ্যাঁ? অভিজিতের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। রাত একটার সময়? তখন কোথায় ছিল সে? কল্যাণ তাকে দেখলই-বা কী করে? কল্যাণ তো বেশি রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকে না।

খুব সাবধানে সে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছিল কাল রাত একটায়?

তুমি এসে আমাদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে সুমিত্রার নাম ধরে চিৎকার করছিলে! মনে নেই তোমার? অত রাত, লোকের ঘুম ভাঙিয়ে পাড়া জাগিয়ে চিৎকার-তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

অভিজিৎ মিনমিন করে বলল, সুমিত্রা আছে কি না দেখতে গিয়েছিলাম। ওকে তো আমারই নিয়ে আসার কথা ছিল

তা বলে রাত একটার সময়? অত রাতে কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো মেয়ের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকে? আমার মা তো ভেবেছিলেন বুঝি হঠাৎ কোনো বিপদ-আপদ হয়েছে।

সুমিত্রা কার সঙ্গে গেল?

তুমি এখনও সেটা জানো না? কেন, রাত্রে বাড়ি ফেরোনি? দেখা হয়নি সুমিত্রার সঙ্গে?

তা হয়েছে, মানে–

সুমিত্রাকে তো আমিই পৌঁছে দিয়ে এলাম, প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম–তুমি কাল কোথায় গিয়েছিলে? একেবারে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না, হাঁটতে পারছিলে না, আমি তো ভেবেছিলাম আমাদের বাড়িতেই তোমাকে শুইয়ে রাখব। তা তোমার এক বন্ধু

কে বন্ধু?

তা আমি কী করে জানব? ট্যাক্সির মধ্যে বসেছিল, হঠাৎ বেরিয়ে এসে তোমার হাত ধরে এমন টানাটানি শুরু করে দিল, সে এক বিশ্রী দৃশ্য। রাত্রিতে তুমি বাড়ি ফিরতে পারবে কি না তা ভেবেই ভয় পাচ্ছিলাম। এখন শরীর ঠিক আছে?

হ্যাঁ। আচ্ছা কল্যাণ, একটু জরুরি কাজ আছে, কাল তোমার সঙ্গে কথা বলব।

ঠিক আছে, তুমি কাজ করো। তবু একটা কথা বলি অভিজিৎ, এতটা বাড়াবাড়ি মোটেই ভালো নয়। মদ খাওয়াটা এমন কিছু দোষের নয়, কিন্তু তুমি যা করছ, কাল তোমার মুখখানা যেরকম ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল

ঠিক আছে, ঠিক আছে, পরে কথা হবে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে অভিজিৎ গুম হয়ে বসে রইল। কেউ উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করলেই রাগ হয়। অভিজিৎ নিজেই তো মরমে মরে আছে। কাল তাহলে খুব কেলেঙ্কারিই হয়েছিল। ইস, কল্যাণদের বাড়ি অত রাত্রে, কল্যাণের মা-বাবা সবাই জেনে গেছেন–

প্রিয়ব্রতকে ফোন করলে সব ঘটনাটা জানা যেত। কিন্তু প্রিয়ব্রতর বাড়িতে ফোন নেই এখন। অফিসে টেলিফোন ছিল, চাকরি ছাড়ার পর লাইন কেটে দিয়েছে। প্রিয়ব্রত কী যেন বলছিল কাল? নিজের ব্যবসার কথা। প্রিয়ব্রতর দ্বারা ওসব হবে না, কিছু করতে গেলে আরও ডুববে।

কল্যাণ কী এখন তার বাড়িতে ফোন করবে? সুমিত্রাকে বলে দেবে কালকের ঘটনাটা। এক- একজন লোক আছে, খুব গল্প করে বেড়াতে ভালোবাসে। তা ছাড়া এটা তো বেশ মুখরোচক গল্প। বাড়ির জামাই মাতাল হয়ে রাত একটার সময় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করেছে। ইস, সত্যি কাজটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। না, এ-রকম আর চলবে না। নিশ্চয়ই প্রিয়ব্রতটা তাকে জোর করে খাইয়েছে!

বেয়ারাকে দিয়ে কিছু স্যাণ্ডউইচ আর কফি আনিয়ে অভিজিৎ লাঞ্চ সেরে নিল। আবার ডুব দিল কাজে। মুখ তুলল প্রায় সাতটার সময়।

সহকর্মীরা প্রায় সবাই চলে গেছে। চলো অভিজিৎদা, বাড়ি যাওয়ার পথে একটু বিয়ার খেয়ে যাই।

অভিজিৎ বলল, না ভাই, আমাকে আজ বাড়ি ফিরতে হবে। তুমি যাও।

বিমানের পরবর্তী অনুরোধ-উপরোধ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারল অভিজিৎ। আজ সে সাংঘাতিক দৃঢ়। সোজা গিয়ে বাড়ি ফেরার মিনিবাস ধরল।

৩. সুমিত্রা যে কী খেতে ভালোবাসে

সুমিত্রা যে কী খেতে ভালোবাসে, অভিজিৎ তা আজও জানে না। সকাল বেলা সে অফিস যাওয়ার সময় একলাই খায়, খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরিয়ে যায়। রাত্রে অধিকাংশ দিনই তার জ্ঞান থাকে না। সুমিত্রা কখন কী খায় সে তা জানে না। ইদানীং কয়েকদিন সে তাড়াতাড়ি সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসছে, রাত্তির বেলা সুমিত্রার সঙ্গেই খেতে বসেছে, কিন্তু খাবারদাবার উপাদেয় কিছু নয়। সুমিত্রা নিজে রান্না করবে, অভিজিৎ তা আশা করে না। কিন্তু বুড়ি রাঁধুনিই বা এত খারাপ রাঁধে কেন? আর চাকরটা নিশ্চয়ই বাজারে ফাঁকি দেয়। তাই সেদিন সকাল বেলা সে ঘোষণা করল, সে নিজেই বাজারে যাবে।

সুমিত্রা হেসে ফেলল, হঠাৎ তোমার এই শখ কেন?

বাঃ, মাঝে মাঝে ভালো-মন্দ খেতে ইচ্ছে করে না? তুমি কী খেতে ভালোবাসো?

আমার সবই ভালো লাগে।

তা কখনো হয়? দোকানে তো দেখেছি, তুমি চাইনিজ খাবারই বেশি পছন্দ করো। কিন্তু বাড়িতে তো সে রান্না হয় না। কী তোমার ভালো লাগে–মাছ না মাংস? কোন মাছ, কোন মাংস, কোন তরকারি?

তোমার যা পছন্দ হয় নিয়ে এসো। আজ তাহলে আমি নিজেই রাঁধব।

না না, তোমাকে রাঁধতে হবে না। রাঁধুনিকে একটু দেখিয়ে দিয়ো–

ও বুড়োমানুষ চোখে ভালো দেখে না, ওর আর রান্নায় হাত নেই!

তাহলে ওকে ছাড়িয়ে দিচ্ছ না কেন?

বাঃ, বুড়োমানুষটাকে ছাড়িয়ে দিলে ও কোথায় যাবে এখন? আর কী কোথাও কাজ পাবে? ঠিক আছে, এখন থেকে আমিই মাঝে মাঝে রাঁধব।

বাড়ির রাঁধুনি যদি ঠিকমতন রান্না করতে না পারে তবু তাকে রাখতে হবে? সুমিত্রার মন বড়ো কোমল, সে কারুকেই চাকরি থেকে ছাড়াতে চায় না। তা বলে সুমিত্রা রোজ নিজে রান্না করতে যাবে কেন? ওর তো অভ্যেস নেই।

না, না, তোমাকে রান্নাঘরে সময় কাটাতে হবে না। একটা অন্য কিছু ব্যবস্থা করলেই হবে।

চাকরকে নিয়ে অভিজিৎ বাজারে বেরোল। ছেলেবেলা থেকেই সে কখনো বাজারের মধ্যে বিশেষ ঢোকেনি। আলু, পটল বা মাছের কোনটার কত দাম সে সম্পর্কে তার কোনো আন্দাজই নেই। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে সে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার খবর দেখে।

তবু বাজারে ঢুকে সে রীতিমতো দরাদরির অভিনয় করে একগাদা জিনিসপত্র কিনে ফেলল। অসময়ের এঁচোড় থেকে শুরু করে বড়ো কাঁকড়া পর্যন্ত।

চাকরকে দিয়ে বাজারটা আগে পাঠিয়ে দিয়ে অভিজিৎ গেল হাজরার মোড়ের দিকে। তার নিজস্ব ব্র্যাণ্ডের সিগারেটটা সব দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না, মোড়ের বড়ো দোকানটায় যদি পাওয়া যায়।

বাসস্টপে একজন মহিলা একটি বাচ্চামেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির গায়ে স্কুলের পোশাক, হাতে বই-খাতার ব্যাগ। একটা ভিড়ে ভরতি দোতলা বাস এসে থামল, তার গহ্বরের মধ্যে মেয়েটিকে ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হল কোনোরকমে। অভিজিৎ ভাবল ইশ, ওইটুকু মেয়ে একা একা স্কুলে যায়? ওদের স্কুলের বাস নেই?

সিগারেটের প্যাকেট কিনে অভিজিৎ একটা ধরিয়েছে, তখন দেখল মেয়েটির মা তার দিকেই আসছে। মহিলার পরনে সাধারণ আটপৌরে শাড়ি, মুখটি বেশ সুশ্রী কিন্তু কোনো প্রসাধন নেই। মনে হয় যেন রান্নাঘর থেকে উঠে এসেছে।

মহিলাটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে সে, একটু অবাক হল। এ কে?

অভিজিৎ দাঁড়িয়ে ছিল পানের দোকানের সামনে। মহিলাটি অভিজিতের পাশ দিয়ে এসে ওই দোকানে পান কেনার জন্যে দাঁড়াল।

তারপর হঠাৎ অভিজিতের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ভালো আছেন?

অভিজিৎ চিনতে পারল না। সে একটু থতমত খেয়ে গেল। কে রে বাবা? কোথায় দেখেছে একে? কিছুই তো মনে আসছে না।

মহিলা আবার জিজ্ঞেস করল, আপনার বন্ধু চলে গেছে?

না, মানে-ইয়ে বোধহয় গেছে, আমি ঠিক জানি না।

আমি এই কাছেই থাকি।

অভিজিৎ বোকার মতন হেসে বলল, ও, আচ্ছা!

মেয়েটি পান কিনে নিয়ে চলে গেল। আর কিছু বলল না। অভিজিৎ মেয়েটির চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে মনে সে মাথা খুঁড়ছে কিন্তু কিছুতেই ওর সম্পর্কে কিছু মনে করতে পারছে না। আশ্চর্য!

বাড়ি ফেরার পথটুকুও অভিজিৎ ওই মেয়েটির কথাই ভাবতে লাগল। এটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার, তার কী স্মৃতিশক্তি একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? একজন তাকে চেনে অথচ সে তার নামটা মনে রাখা দূরের কথা, কোথায় দেখেছে তাও মনে করতে পারছে না?

সে অভিজিৎ সেনগুপ্ত, এক সময় ছিল নামকরা ভালো ছাত্র, অঙ্ক আর ইংরেজিতে বরাবর ফার্স্ট হয়েছে, আর সে-ই এখন কিনা মানুষের মুখ মনে রাখতে পারছে না! কল্যাণদের বাড়িতে সে রাত একটায় গিয়েছিল, সে ঘটনা তার মনে নেই, সেটা এমন কিছু আশ্চর্য

ব্যাপার নয়, খুব বেশি মদ খাওয়ার পর এ-রকম হয়। এর নাম অ্যামনেশিয়া। মেয়েটিকে কী সেরকম মত্ত অবস্থায় দেখেছিল কোনোদিন?

বেশ্যাদের নিয়ম হচ্ছে, রাস্তায় কোনো চেনা লোককে দেখলেও কথা বলে না। এটাই ওদের পেশার রীতি। কিন্তু মেয়েটি তো তাকে চিনল এবং বলল। তা ছাড়া ওকে দেখলে তো

বাড়ির সিঁড়িতে পা দেওয়ার পর অভিজিতের মনে পড়ল। মেয়েটিকে সে দেখেছিল, রতনলাল চাড্ডার ফ্ল্যাটে। অল্প একটুক্ষণের জন্যে। সে-দিন মেয়েটির মুখখানা ছিল রং মাখা, ঠোঁটে ছিল গাঢ় লিপস্টিক, হাতে সিগারেট, হুইস্কির গ্লাসে ও চুমুক দিচ্ছিল। তাকে আজ এ রকম আটপৌরে পোশাকে দেখলে চিনবে কী করে? অভিজিতের কোনো দোষ নেই।

আজ ও নিজের মেয়ের হাত ধরে স্কুলে যাওয়ার জন্যে বাসে তুলে দিতে এসেছিল, ঠিক সাধারণ কোনো বাড়ির বউয়ের মতন। আর সে-দিন রতনলাল চাড্ডা যখন কথা বলতে বলতে ওর উরুতে থাপ্পড় মারছিল, তখন মেয়েটি হাসছিল খিলখিল করে। সে-দিন মেয়েটির ওপরেই রাগ হয়েছিল, আজ রাগ হল রতনলালের ওপর। টাকা আছে বলে এরা সবকিছুই কিনতে পারে।

সুমিত্রা বলল, তুমি এত সব জিনিস কিনে এনেছ! তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে?

অভিজিৎ বলল, কই, বেশি জিনিস আনিনি তো!

বাজারে আর কোনো জিনিস বোধহয় বাকি নেই। অন্য লোকদের জন্যেও তো কিছু রাখতে হয়।

একদিন বাজারে গেলাম, সেদিন কি আর কিপটেমি করলে চলে?

তুমি কাঁকড়া ভালোবাসো, তা এতদিন আমাকে বলোনি কেন?

কেন, তুমি ভালোবাসো না? তোমার কথা ভেবেই তো আনলাম।

হ্যাঁ, আমিও ভালোবাসি, কিন্তু কী করে রান্না করতে হয় জানি না। ঠিক আছে, পাশের বাড়ির শান্তাদির কাছ থেকে জেনে নিচ্ছি। তবে এবেলা তো এত তাড়াতাড়ি হবে না।

অভিজিৎ হেসে বলল, তোমার মাথা খারাপ! এবেলা খাব কী করে? কাঁকড়া খেতে তো এক ঘণ্টা লাগে! তাহলে আর চাকরি-বাকরি থাকবে না।

এবেলা মাছ রান্না করে দিক, ওবেলা কাঁকড়া খেয়ো।

ন-টা বাজে। খুব বেশি তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই! আজ একটু দেরি করে অফিস গেলেও চলবে।

অভিজিৎ আরাম করে সকালের অসমাপ্ত খবরের কাগজখানা কিছুক্ষণ পড়ল। তারপর স্নান করতে গেল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন অফিসে বেরোচ্ছে, তখন সুমিত্রা তার বাহু ছুঁয়ে খুব আন্তরিক নরম গলায় বলল, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরবে, কথা দাও?

অভিজিৎ বলল, নিশ্চয়ই! কেন কাল ফিরিনি?

আজ তুমি নেশা করে আসবে না?

না, না, তুমি এত ভাবছ কেন? অফিসে একটু কাজ আছে।

ন-টা, সাড়ে নটার বেশি দেরি কোরো না। আমি কিন্তু বসে থাকব।

অত দেরিও হবে না!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে অভিজিৎ মোড়ের দিকে হাঁটতে লাগল শেয়ারের ট্যাক্সি ধরার জন্যে। দেখল, আগে আগে সেই মেয়েটি হেঁটে যাচ্ছে। এবার শাড়ি বদলেছে, একটু সেজেছেও। আশ্চর্য, একই দিনে পরপর দু-বার দেখা। মেয়েটি তো তখন বলল, কাছাকাছি কোথাও থাকে। কিন্তু এত দিনের মধ্যে আর তো একবারও দেখা হয়নি। আজই দু-বার। এ-রকম হয়, কোনো নতুন ইংরেজি শব্দ শিখলে সেদিনই সেটা খবরের কাগজে দেখা যায়। আবার কোনো লোকের মুখেও শোনা যায়।

কী যেন নাম মেয়েটির? একটু অদ্ভুত ধরনের! হ্যাঁ, মনে পড়েছে শেলি দত্ত! মেয়েটির নাম শেলি, অদ্ভুত নয় তো কি? হয়তো ওটা ওই মেয়েটির আসল নাম নয়। ওসব জায়গায় কেউ আসল নাম বলে না।

চলতে চলতে মেয়েটি একবার পাশের দিকে মুখ ফেরাল। প্রায় চমকে উঠল অভিজিৎ। দারুণ বিষণ্ণ মুখখানা। যেন কত রকমের দুঃখ ওর বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে। আশ্চর্য, এখন কে ওকে দেখে বিশ্বাস করবে যে সেদিন ওই মেয়েটিই রতনলাল চার ঘরে খিলখিল করে হেসেছিল। মেয়েটি বোধ হয় বাসে উঠবে! তার আগেই অভিজিৎ শেয়ারের ট্যাক্সি ধরে ফেলল।

অফিস এসে অভিজিৎ দেখল, তার টেবিলের ওপর কোম্পানির মালিকের পাঠানো একটি চিরকুট--অভিজিৎ যেন অফিসে এসেই একবার মালিকের সঙ্গে দেখা করে।

কোম্পানির মালিক মি. বিষ্ণু রক্ষিত বেশিরভাগ সময়েই থাকেন দিল্লিতে। তাঁর অন্য ব্যবসাও আছে। এই কোম্পানিতে আরও কয়েকজনের শেয়ার থাকলেও, ইনিই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ইদানীং কোম্পানির অবস্থা তেমন সুবিধের নয়।

এক গেলাস জল খেয়ে, জরুরি চিঠিপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে অভিজিৎ গেল মালিকের ঘরে।

মি. রক্ষিত মানুষটি বেশ ভদ্র। আস্তে আস্তে কথা বলেন। ভদ্রলোকের ফুলের খুব শখ। নিউ আলিপুরে ওঁর বাড়ির বাগানে খুব দামি দামি ফুলগাছ আছে। অভিজিৎকে দেখে তিনি বললেন, বসুন। আপনার ঘরে কেউ অপেক্ষা করে নেই তো? খানিকক্ষণ সময় লাগবে।

অভিজিৎ বলল, না, কেউ নেই।

উনি টেবিল থেকে একটা টাইপ করা কাগজ তুলে নিয়ে বললেন, আমি চারজনের নাম এখানে ঠিক করে রেখেছি। আপনি একবার দেখুন।

কী ব্যাপারে?

এদের ছাঁটাই করতে হবে।

অভিজিৎ আঁতকে উঠল একেবারে। ছাঁটাই? এই বাজারে? প্রাইভেট কোম্পানি, এখানে চাকরির কোনো স্থায়িত্ব নেই। এক মাসের নোটিশেই যে কারুর চাকরি যেতে পারে। এবং সেই ছাঁটাইয়ের চিঠিতে সই করতে হবে অভিজিৎকেই, কারণ সে ম্যানেজার।

নামগুলোর দিকে একবার অলসভাবে চোখ বুলিয়ে নিল অভিজিৎ।

মি. রক্ষিত ধানাইপানাই করা পছন্দ করেন না। যেকোনো ব্যাপারে স্পষ্ট সোজাসুজি মতামত দেন। যদিও উনি দিল্লিতে থাকেন বেশিরভাগ সময়, তবু এ-অফিসের প্রতিটি কর্মচারী সম্পর্কে খবরাখবর রাখেন। কার কতটা কাজ, কে কতটা যোগ্য, সবই ওঁর জানা। যে চারজনের নাম উনি লিখেছেন, কোনো সন্দেহ নেই, সেই চারজনেরই কাজ এখন সবচেয়ে কম।

মি. রক্ষিত আবার বললেন, বিজনেস এ বছরে খুব ভালো। বছর প্রায় শেষ হয়ে গেল। কিন্তু গতবছর যত অর্ডার এসেছিল, এবছর এখন পর্যন্ত তার অর্ধেকও আসেনি। নানারকম ট্যাক্স বসাবার জন্যে কোম্পানিগুলো খুব শাই হয়ে গেছে। ছাঁটাই না-করে উপায় কী বলুন? সবাইকে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে হবে। কাজকর্ম অনেক

কমে গেছে। এখন শুধু শুধু কয়েকজনকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেওয়া তো যায় না! তারা অন্য জায়গায় কাজ খুঁজে নিক আমার হিসেবমতন সাতজনকে ছাঁটাই করা উচিত। তারা সারপ্লাস। তবু আমি খুব কম করে চারজনকে ধরেছি

অভিজিৎ নাম চারটে বার বার দেখতে লাগল। প্রত্যেকেই তার বিশেষ চেনা। এরমধ্যে এক জন একটু ফাঁকিবাজ ঠিকই, বাকি তিন জন নির্ভরযোগ্য কর্মী। এদের মধ্যে অসীমকে সে নিজেই চাকরি দিয়েছে প্রায়। ছেলেটির খুবই অভাবের সংসার, যদিও সবসময় হাসিখুশি থাকার একটা ক্ষমতা আছে তার। অভিজিৎ নিজের নাম সই করা চিঠিতে এদের বরখাস্ত করবে?

ক্ষুণ্ণভাবে সে বলল, কিন্তু ছাঁটাই করতে গেলে গোলমাল হবেই।

মি. রক্ষিত বললেন, আপনাকে তো বললামই, যদি ছোটোখাটো গোলমাল হয়, তাহলে সেটা চাপা দেবার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি বড়ো রকমের গোলমাল হয়, সহজে না থামে

মি. রক্ষিত হঠাৎ চুপ করে গেলেন। অভিজিৎ ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইল।

মি. রক্ষিত মুখ নীচু করে হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বললেন, সহজে যদি গোলমাল না থামে, তাহলে অফিস তুলে দিতে হবে!

অফিস তুলে দেবেন?

আর কী করা যাবে। একেই লোকসান চলছে, এরপর যদি স্টাফরা গোলমাল করে, তাহলে লোকসান আরও বাড়বে। তারপর অফিস তুলে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী? তখন আর আলাদা করে কারুকে ছাঁটাই করতে হবে না।

আপনি এতদূর পর্যন্ত ভেবেছেন?

ভাবতে তো হচ্ছেই। অবশ্য আমার এ কোম্পানি উঠে গেলে আপনার কোনো অসুবিধে নেই, আপনি পাবলিসিটি লাইনে নামকরা লোক। আপনার চাকরির অভাব হবে না, যেকোনো কোম্পানি আপনাকে লুফে নেবে, এর আগেও তো অনেকে আপনাকে এখান থেকে ভাঙিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। অন্য জায়গা থেকে অভিজিৎ দু-তিনটে ভালো সুযোগ পেলেও এ অফিস ছাড়তে চায়নি। কারণ, এখানে কাজের ব্যাপারে মালিকের তেমন হুকুমদারি নেই, সে ইচ্ছেমতন কাজ করতে পারে, এবং মালিক উপস্থিত না-থাকলে সে-ই সর্বেসর্বা।

অভিজিৎ বলল, কিছু নতুন অর্ডার যদি জোগাড় করা যায়, আর কারুকেই ছাঁটাই করতে হয় না।

চেষ্টা তো করছি। পাচ্ছি কোথায়? বাজার খুব খারাপ। দুর্গাপুরের যে-কাজটা পাওয়ার কথা ছিল। সেটা হল না শেষপর্যন্ত। ন্যাশনাল নিয়ে নিয়েছে।

হঠাৎ অভিজিৎ উৎসাহের সঙ্গে বলল, স্যার, আমার হাতে একটা কাজের সন্ধান এসেছে, প্রায় লাখ দুয়েকের মতন, সেটা পেলে

কোন কোম্পানির?

নতুন কোম্পানি। শিলং-এ একটা বিয়ারের কারখানা হচ্ছে, সেটার কাজ–টাকাটা আরও বেশিও হতে পারে।

মিস্টার রক্ষিত চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, ও, সেই বাবুভাইয়ের কারবার?

আপনি চেনেন বাবুভাইকে?

সে তো এক ভারতবিখ্যাত চোর, তাকে না-চেনে কে? থাক, সে চোর হোক-বা নাই হোক, তা গভর্নমেন্ট বুঝবে। আমাদের কাজ পেলেই হল। দেখুন যদি কাজটা জোগাড় করতে পারেন।

আমি বাবুভাইকে চিনি না, তবে রতনলাল চাড্ডা বলে একজন ব্যবসায়ী বোধ হয় এদিককার কনট্রাক্ট নিচ্ছে।

তারও নাম শুনেছি। হাতে অনেক কাঁচা টাকা। ধরুন-না কাজটা, তবে পাবেন কি না সন্দেহ আছে।

আমাকে মাসখানেক সময় দিন। যদি কাজটা পাই, তখন তো আমাদের কাজের লোকও লাগবে? তাহলে আর এই চার জনকে ছাঁটাই করে–

মি. রক্ষিত চোখ খুলে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন অভিজিতের দিকে। তারপর বললেন, বেশ তো, দিলাম একমাস সময়। চেষ্টা করে দেখুন!..হর্টিকালচারাল গার্ডেনসে যে ফুলের প্রদর্শনী হচ্ছে, সেটা দেখেছেন? এই এত বড়ো বড়ো গোলাপ এত বড়ো-বিশ্বাসই করা যায় না...

হঠাৎ ফুলের প্রসঙ্গ আসতে অভিজিৎ একটু চমকে গেল। অবশ্য মি. রক্ষিত এক বিষয় নিয়ে বেশিক্ষণ কথা বলা পছন্দ করেন না। তবু কতকগুলো লোকের চাকরি যাওয়া মানে তাদের জীবন-মরণের সমস্যার মতন। তারমধ্যে হঠাৎ ফুলের কথা। মি. রক্ষিত আবার বললেন, একদিন আসুন আমাদের বাড়িতে। লোকের ধারণা গরম জায়গায় চেরি ফুল ফোটে না। আসুন, আপনাকে দেখাব, আমার বাগানে চেরি ফুল ফুটিয়েছি।

অভিজিৎ শুকনোভাবে বলল, তাই নাকি? গিয়ে দেখতে হবে তো!

একটুবাদে অভিজিৎ উঠে দাঁড়াল। মি. রক্ষিত হাতের একটা আঙুল দেখিয়ে বললেন, তাহলে ওই কথা রইল। এক মাস। আপনাকে আমি এক মাস সময় দিলাম।

অভিজিৎ নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখল অসীম নামের সেই ছেলেটি বসে আছে। এরমধ্যেই খবর পেয়ে গেছে নাকি? অফিসের যেকোনো খবরই এক নিমেষে রটে যায়।

কী খবর, অসীম?

অভিজিৎদা, আমার দিন সাতেকের ছুটি চাই।

কবে থেকে?

আজ বিকেলেই চলে যাব।

কেন হঠাৎ? কিছু হয়েছে?

বেনারসে মাকে পাঠিয়েছিলাম, আমার ছোটোকাকার কাছে, হঠাৎ সেখানে মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খবর পেলাম।

ও, তাহলে তো যেতেই হবে। ঠিক আছে, চলে যাও।

সাত দিনের মধ্যেই ফিরব আশা করছি। এখন তো কাজও বেশি নেই

ঠিক আছে, ঠিক আছে।

অসীম চলে যাওয়ার পর অভিজিৎ একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলল। ও এখনও জানে না, ওর মাথার ওপর কী খাঁড়া ঝুলছে। ছুটি থেকে ফেরার কিছুদিন পরেই ছাঁটাইয়ের নোটিশ পাবে। ইতিমধ্যে ওর মায়ের যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তাতেও কি ওর ছাঁটাই আটকাবে? চিঠিতে সই থাকবে অভিজিতের। অসীম কী বুঝবে? অসীম ভাববে তার এত দুঃসময়েও অভিজিৎ তাকে ছাঁটাই করে দিল।

দুরছাই, আর ভাবতে ভালো লাগে না। মালিকের কাছে হঠাৎ সে কেন বিয়ার কোম্পানির কাজটার কথা বলতে গেল? সে তো ভেবেছিল, ওই ব্যাপারে আর মাথা ঘামাবে না।

রতনলাল চাড্ডা মানুষ সুবিধের নয়, ওই ধরনের লোকের সঙ্গে সে আর কোনো যোগাযোগ রাখতে চায় না। ওদের কাছাকাছি গেলেই গায়ে নোংরা লাগে।

কিন্তু এখন এই কাজটা জোগাড় করার ওপরেই অফিসের চার জনের চাকরি নির্ভর করছে। অসীম ছাড়া আর তিন জনই বিবাহিত। অসীমের আছে বিধবা মা। বাজার সত্যিই খারাপ, হঠাৎ চাকরি গেলে ওরা এ লাইনে সহজে আর কোথাও চাকরি পাবে না।

অভিজিতের পক্ষে এখন এই অফিস থেকে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ন্যাশনাল থেকে তো তার কাছে অফার দেওয়া আছেই। যেকোনো দিন ওদের কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করলেই হল। মাইনেও কিছু বেশি পাওয়া যাবে। অবশ্য সেখানে তার মাথার ওপর আরও তিনজন থাকবে, কিন্তু তাতে কী, চাকরি হচ্ছে চাকরি। নিজের কাজটা ঠিকমতো করে গেলেই হল।

ন্যাশনালের মিত্তিরকে ফোন করতে গিয়েও থেমে রইল অভিজিৎ। কয়েক মিনিট ভেবেও মনস্থির করতে পারল না। মি. রক্ষিতকে সে কথাও দিয়ে এল দু-লাখ টাকার কাজটার জন্যে চেষ্টা করবে। এরমধ্যে হঠাৎ কেটে পড়াটা কাপুরুষতা নয়? সে চলে গেলে, ওই চার জনের ছাঁটাই হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। এটা তার বিবেকের ওপর একটা বোঝা হয়ে থাকবে সারাজীবন। কিন্তু ওই চার জনের চাকরি বাঁচাবার জন্যে তাকে রতনলাল চাড্ডার মতন নোংরা লোকের সংস্পর্শে যেতে হবে। ওই চার জন কি তা কোনোদিন জানবে?

এইরকম অবস্থায় কিছুতেই মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। অভিজিৎ ঝট করে বেরিয়ে অফিসের প্রায় উলটো দিকের বারে গিয়ে ঢুকল। এখন একটু বিয়ার না খেলে কিছু চিন্তাই করা যাবে না। সুমিত্রা তার মদ খাওয়ার জন্যে ভয় পায়। সুমিত্রা বুঝবে কী করে, পুরুষমানুষকে কতরকম ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়তে হয়। আজ অফিসে এসেই যে এইরকম একটা অদ্ভুত অবস্থায় পড়বে, সে-কথা কি সে সকালেও ভেবেছিল?

বিয়ার খেলে তো আর বেশি নেশা হয় না। তাও এখন দুপুর। সন্ধ্যের পর ঠিক অবস্থাতেই সে বাড়ি ফিরবে। সুমিত্রা রেঁধেছে, খেতে হবে ভালো করে।

ফেনা ভরতি বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিয়ে অভিজিৎ মাথার চুল খিমচে ধরল। ভালো লাগছে না, কিছুই ভালো লাগছে না! এখন রতনলাল চাড্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কী করে? সে-দিন শেষপর্যন্ত ভালো করে কিছুই কথা হয়নি। তবে লোকটা উৎসাহ দেখিয়েছিল ঠিকই।

নিখিল কি শিলং থেকে ফিরেছে? নিখিলকে দিয়েই কাজটা করাতে হবে। নিখিল আজকাল অনেক বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে মেশে। সেদিন ওর কথাবার্তা শুনে মনে হল, ও রতনলাল চাড্ডার কাছে বাবুভাইয়ের দূত হয়ে এসেছে। বাবুভাই নাকি বিখ্যাত চোর।

নিখিল কোথায় উঠেছে তার ঠিক নেই। বাদলের কাছে খবর পাওয়া যেতে পারে। বাদল এইসময় বাড়িতেই থাকে। সে তো ঘুম থেকেই ওঠে এগারোটার সময়। বার থেকেই টেলিফোন করল বাদলকে। তাকে পাওয়া গেল। বাদল বলল, কী ব্যাপার, হঠাৎ এত সকাল সকাল ফোন?

সকাল কোথায় রে, দেড়টা বাজে।

ওই হল। এরমধ্যেই কী মাল খাওয়া শুরু করব নাকি?

না, সেজন্যে নয়। নিখিল কোথায় জানিস?

শিলং গেছে, কাল-পরশু ফিরবে।

আচ্ছা, সেই যে, রতনলাল চাড্ডার সঙ্গে সে-দিন আলাপ হয়, তার সঙ্গে কী করে যোগাযোগ করা যায় বল তো?

দেখ অভিজিৎ, তোর ব্যাপারটা কী? তুই এই দুপুরে আমাকে টেলিফোন ধরার জন্যে তেতলা থেকে এক তলায় নামিয়ে শুধু নিখিল আর রতনলাল আর হ্যানো-ত্যানোদের কথা জিজ্ঞেস করবি? কেন, আমি কি ওদের দালাল?

অভিজিৎ একটু চুপ করে গেল। কোনো কারণে বাদলের মেজাজ খুব খারাপ। কিন্তু ওর সাহায্যের যে দরকার। বলল, এত রেগে আছিস কেন?

আসল কথাটা কী খুলে বল না।

একটা ব্যাপারে বড় বিপদে পড়েছি। তোর সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার।

বিয়ার খাওয়াবি?

সে আর এমন কথা কী।

ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যে বেলা কোথায় দেখা করছি বল?

অভিজিৎ আবার থমকে গেল। সন্ধ্যে বেলা? বাদলের সঙ্গে একবার বসলে সহজে ওঠা যাবে না। বাদলটা একটা মদের পিপে। বলল, বাদল, তুই এখন একটু আসতে পারবি? সন্ধ্যে বেলা আমার একটু অসুবিধে আছে।

এখন? এই দুপুর রোদ্দুরে কোনো ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরোয়?

কোনোদিন তো আর অফিসে কাজ করলি না, বেশ আরামে আছিস। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আয় না।

ঠিক আছে। ধর, এই চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আসছি।

আমি অপেক্ষা করছি। আমাদের অফিসের উলটো দিকে, কাউন্টারের পাশেই। টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে অভিজিৎ একবার চট করে অফিস থেকে ঘুরে এল। দরকারি কাজ-টাজ সম্পর্কে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে, তার বেয়ারাকে বলে এল, মি. রক্ষিত খোঁজ করলে বলবে, জরুরি কাজে বেরিয়ে গেছি।

বাদল এল অনেক দেরি করে। কোনোদিনই সে সময়ের ঠিক রাখে না। অপেক্ষা করতে করতে অভিজিতের দু-বোতল বিয়ার খাওয়া হয়ে গেল।

বাদল এল রীতিমতন সাজগোজ করে। কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, গায়ে দামি সেন্টের গন্ধ।

টেবিলের উলটো দিকে বসে বাদল বলল, রতনলাল চাড্ডার কাছে সেই পাবলিসিটির কাজটা তোর চাই, তাইনা?

ঠিক ধরেছিস।

দু-আড়াই লাখ টাকার কারবার হবে। বেশ ভালো দাঁও। কাজটা পেলে তুই কোম্পানি থেকে কত কমিশন পাবি?

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল অভিজিৎ। বাদল কি তার সমস্যাটা বুঝবে? সে কাতরভাবে বলল, কমিশন নয়, এখন অফিসটাকে বাঁচানোই আমার প্রধান কাজ। কাজটা আমায় পেতেই হবে।

সে-দিন তুই হঠাৎ উঠে চলে এলি কেন?

বলছিলাম না, আমার স্ত্রীকে আনবার কথা ছিল।

হু!

কেন, আমি চলে আসার পর কি কিছু কথা হয়েছে?

তা হয়েছে! তবে সেরকম কিছু নয়।

বিয়ারের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বাদল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। অভিজিৎ অধীর হয়ে উঠেছে। আর ভালো লাগছে না। কী কুক্ষণে যে সে-দিন ট্যাক্সি খুঁজতে গিয়ে নিখিল আর বাদলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বিয়ারটা যথেষ্ট ঠান্ডা নয় বলে বেয়ারাকে বকুনি দিয়ে অভিজিৎ আরও দু-বোতল আনতে বলল। তারপর বাদলকে জিজ্ঞেস করল, তোর কি মনে হয় কাজটা আমি পেতে পারি?

তা পারিস।

তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা দরকার। অন্য ফার্মগুলো মুখিয়ে আছে, কোনোক্রমে খবর পেয়ে গেলেই ছোঁক ছোঁক করবে। আজই একবার রতনলালের সঙ্গে দেখা করা যায় না?

যায়।

কখন?

রাত দশটার পর।

ওঃ, তাহলে আজ হবে না।

কেন রাত দশটায় তুই কোথায় থাকবি?

অভিজিতের মুখে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। সব কথা সকলকে বোঝানো যায় না। সে যদি এখন বাদলকে বলে যে, আজ রাতে সে, তার বউয়ের রান্না করা কাঁকড়া খাবে, তাহলে বাদল হাসবে না? এত বড়ো একটা কাজের তুলনায় কাঁকড়া খাওয়াই বড়ো হল? অথচ সুমিত্রাকেই বা কী বোঝাবে? সুমিত্রাকে আজও যদি সে বলে যে একটা জরুরি কাজের জন্যে সে রাত্রে ঠিক সময় ফিরতে পারবে না, তাহলে সুমিত্রা নিশ্চিত ভাববে, সে আবার মিথ্যেকথা বলছে। টেবিলের ওপর ঠক করে গেলাসটা নামিয়ে অভিজিৎ রাগের সঙ্গে

বলল, রাত দশটার আগে দেখা করা যাবে না, সে এমন কী লাটসাহেব? তাকে একটা টেলিফোন করে সন্ধ্যে বেলা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যায় না?

বাদল অভিজিতের রাগকে পাত্তা না দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বলল, না।

তাহলে দরকার নেই।

ভালো কথা। শুধু শুধু আমাকে ডেকে আনলি কেন?

তুই আর নিখিলই তো সেদিন বললি, ওই কাজটা আমি পেতে পারি।

এখনও তো বলছি, তুই পেতে পারিস।

তা বলে রাত দশটার আগে লোকটার সঙ্গে দেখা করা যাবে না? কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে কেউ অত রাতে দেখা করতে যায়?

তোকে কে বলেছে যে রতনলাল চাড্ডা ভদ্রলোক?

ভদ্রলোক নয়?

সে-কথায় তোর দরকার কী? তোর দরকার কাজ। কাজের বদলে টাকা!

দুরছাই!

তুই এত অধৈর্য হয়ে উঠছিস কেন অভিজিৎ? ব্যাপারটা কী তোর? তিন বোতল বিয়ার খেয়ে ইতিমধ্যেই অভিজিতের একটু নেশা হয়ে গেছে। সে নিজে অবশ্য তা এখনও টের পায়নি। মুখখানায় দেখা দিয়েছে লালচে আভা।

খানিকটা মুখ ঝুঁকিয়ে দুঃখিত গলায় অভিজিৎ বলল, বাদল, কাজটা আমার চাই। তুই আমাকে একটু সাহায্য কর।

করব তো বলছি। শোন, রতনলাল চাড্ডা টাইপের মানুষের সঙ্গে তো তুই মিশিসনি। ওরা একেবারে অন্য ধরনের। তোর সঙ্গে হাজার মিশলেও কখনো ভেতরের কথা জানতে দেবে না! ওরা কখন কোথায় থাকবে, সেটাও একটা গোপন ব্যাপার। আমার সঙ্গে আজ রাত দশটায় দেখা করার কথা আছে ওর। তখন তোকে নিয়ে যেতে পারি–

বেশ, ঠিক আছে, রাত দশটাতেই যাব, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকব না–কাল বা পরশুর জন্যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে চলে আসব।

তাই করিস।

কাজটা পেতে গেলে আর কী করতে হবে রে?

রতনলালকে খুশি করতে হবে।

তার মানে কী? মেয়ে সাপ্লাই?

উঁহু! সব জায়গায় এক জিনিস চলে না। রতনলালকে কোনো জিনিসই দিতে হবে না। তুই চাস তো রতনলালই তোকে মেয়ে দেবে।

কেন?

ওর শখ। রতনলাল প্রচুর স্কচ হুইস্কি পায়, অন্যদের তা খাওয়াতে ভালোবাসে। ওর হাতে অনেক মেয়েও আছে। সুতরাং তোর কাছ থেকে ও, মদ বা মেয়ে কোনোটাই চাইবে না। তুই ওকে ঘুস দিতেও পারবি না–ওর হাতে এত কাঁচা পয়সা যে দু-পাঁচ হাজার ওর হাতের ময়লা।

তাহলে ওকে কীভাবে খুশি করা যাবে?

তোষামোদ।

শুধু তোষামোদ?

হ্যাঁ। ওর কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে হেঁ হেঁ করে হাসতে হবে। ওর কোনো কথার প্রতিবাদ করা চলবে না। ও যদি বলে জল উঁচু, তুই বলবি উঁচু।

ঠিক আছে, তাই করব। এ আর এমন শক্ত কী?

তোর অভিজ্ঞতা নেই, অভিজিৎ। তুই জানিস না, এটা কত বড়ো ধৈর্যের পরীক্ষা। তোর ব্যক্তিত্ব জিনিসটা একদিন লুকিয়ে রাখতে হবে। মদ খেয়ে একদম মাতাল হয়ে গেলেও চেঁচামেচি করা চলবে না ওর সামনে। তখনও মনে রাখতে হবে, তুই ওর মোসাহেব।

এ-রকম কতদিন চালাতে হবে?

সেটা তোর ভাগ্‌য।

আমি ভাগ্য বিশ্বাস করি না।

তোর আত্মবিশ্বাস আছে, এই কথা বলতে চাস তো? ঠিক আছে, দেখিস।

কী?

দিনের পর দিন একটা অশিক্ষিত লোকের সব কথায় সায় দিতে, তার সবরকম অসভ্যতা সহ্য করতে হবে। একটুও ভুল করলে চলবে না-দেখি, তারপরও তোর আত্মবিশ্বাস কতটা বজায় থাকে।

তাহলে বাদল এইরকম লোকের কাছে তুই বা নিখিল যাস কেন?

নিশ্চয়ই আমাদেরও স্বার্থ আছে। আমরা যেরকম ব্যবহার করব, আমাদের দেখাদেখি তুইও তাই করবি।

তাই সই। আমি সেসবও করতে রাজি আছি। চল, এখন উঠি।

উঠবি! কোথায়?

আমি একবার অফিস যাই, চারটে বাজে।

তুই অফিস যাবি? আমি তাহলে কী করব? আমি তো একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লে আর বাড়ি ফিরি না।

তুই আমার সঙ্গে অফিসে চল, একটু বসবি।

দু-জনে বেরোল। বিয়ার খাওয়ার পর মুখে রোদ লাগলে চিড়বিড় করে। দু-জনেই কপালের ওপর হাত রেখে রোদ আড়াল করে রাস্তা পেরিয়ে এল।

অফিসের ঠিক দরজার কাছে বাদল অভিজিতের একটা হাত চেপে ধরে বলল, তোর কি এখন অফিসে খুব কাজ আছে?

দু-একটা কাজ আছে।

দুর! এই অবস্থায় কাজ করতে ভালো লাগবে?

তুই কী করতে চাস?

চল, একটা ঠাণ্ডা জায়গায় গিয়ে বসব। খনিকটা সময় কাটাতে হবে তো।

আবার মদ খাব? তাহলে দশটা পর্যন্ত সোজা থাকতে পারব না।

না, না। ওসব কিছু নয়। তুই চল তো!

৪. ট্যাক্সি এসে থামল

ট্যাক্সি এসে থামল পার্ক সার্কাসের খুব বড়ো একটা বাড়ির সামনে। দেখলেই মনে হয় পাঁচমিশেলি লোক থাকে। আবার এখানে কোনো নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে, এই ভেবেই অভিজিতের মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। না, নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে আর ভালো লাগে না।

কোথায় যাচ্ছিস রে বাদল?

চল-না।

আমার ভালো লাগছে না, চল, অন্য কোথাও যাই!

এই অভিজিৎ এরমধ্যে তোর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে কেন? সোজাভাবে হাঁট।

লিফট দিয়ে উঠে পাঁচ তলায় লম্বা বারান্দায় এক কোণের দরজার সামনে গিয়ে ওরা দাঁড়াল। বাদল কিন্তু কলিং বেল টিপল না, পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল। তাতে অভিজিতের মনে হল, ফ্ল্যাটটা নিশ্চয়ই খালি।

কিন্তু ভেতরে ঢুকে, প্রথম ঘরটা পেরিয়ে দ্বিতীয় ঘরে এসে অভিজিৎ চমকে উঠল। খাটের ওপর শুয়ে আছে একটি মেয়ে। মেয়েটি ঘুমোচ্ছে। তার লম্বা চুলগুলো পড়েছে খাটের পাশে। একটা হাত বিছানার ওপর এমনভাবে পাতা, ঠিক যেন মনে হয়, সে চাইছে।

অভিজিতের একবার মনে হল, মেয়েটি যেন রূপকথার রাজকন্যা। দৈত্যপুরীতে বন্দি। সে আর বাদল দু-জনে মিলে এসেছে তাকে উদ্ধার করতে।

বাদল ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারায় অভিজিৎকে বলল, চুপ করে থাকতে। তারপর খাটের কাছে গিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে টপ করে মেয়েটাকে একটা চুমু খেল। অভিজিৎ আশা

করেছিল, মেয়েটি চমকে চেঁচিয়ে উঠবে বা একটা নাটকীয় ধরনের কিছু করবে। সেরকম কিছুই হল না। মেয়েটি আস্তে আস্তে চোখ মেলল, বাদলকে দেখে খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করল, কখন এসেছ?

বাদল বলল, আমার এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।

মেয়েটি এবার ধড়মড় করে উঠে বসল। গায়ের আঁচল ঠিক করে বাদলকে ভর্ৎসনা করে বলল, ও মা, কী অসভ্য তুমি! সে-কথা আগে বলতে হয়।

বাদল বলল, আয় অভিজিৎ, আমরা বসবার ঘরে যাই। কেতকী তোমার চাকরটা কোথায় গেল?

ও একটু বাইরে গেছে। আসতে দেরি হবে।

এই রে, তাহলে আমাদের জিনিসপত্তর কে আনবে?

তোমার সঙ্গে আনেনি কিছু?

না।

কেতকী আঁচল-টাচল সামলে একটা চিরুনি হাতে নিয়ে এঘরে এল। বলল, এখন তো সবে বিকেল, যদি চা-টা খাও তো আমি করে দিতে পারি।

বাদল মুখ ভেংচে বলল, ধুস। এখন চা কে খাবে? আমার এই বন্ধুটি খুব ভালো, এর নাম অভিজিৎ।

কেতকী হাতজোড় করে নমস্কার করল! শুয়ে থাকা অবস্থায় অভিজিৎ এক রাজকন্যা ভেবেছিল, আসলে সেরকম দেখতেই নয়। একটু বেঁটে, গোলগাল, মুখখানা ঢলঢলে। মেয়েটির রূপ তেমন নেই, আছে স্বাস্থ্য, এটাই ওর প্রধান সম্পদ বোঝা যায়।

বাদল বলল, তুই বোস অভিজিৎ, আমি একটা বোতল কিনে আনি। আর বিয়ার খেতে ভালো লাগছে না। জিন খাবি?

অভিজিতেরও জিভটা শুকনো শুকনো লাগছে। একবার একটু খাওয়া শুরু করলে তারপর আর এমনি চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে না! একটু জিন বা হুইস্কি হলেই ভালো হয় এখন।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল, আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি।

না, তোর যাবার দরকার নেই। তুই বোস-না, কাছেই দোকান।

অভিজিৎ তবুও যেতে চাইছিল, বাদল তাকে জোর করে বসিয়ে রাখল।

কেতকীও বলল, আপনি বসুন না। শুধু শুধু দু-জনের যাওয়ার দরকার কী?

বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাদল কেতকীকে বলল, আমার বন্ধুকে যত্ন কোরো কিন্তু।

দরজা বন্ধ হওয়ার পর কেতকী অভিজিতের কাছে এসে দাঁড়াল। চিরুনিটা চুলে ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে কীভাবে যত্ন করতে পারি বলুন?

অভিজিৎ বলল, এক গেলাস জল–

কেতকী রান্নাঘর থেকে ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল এনে দিল, তারপর বলল, আর কিছু?

অভিজিতের অস্বস্তি লাগছে। নারীসঙ্গ সে ভালোবাসে। একসময় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছে এইরকম মেয়েদের সন্ধানে। কিন্তু সুমিত্রাকে বিয়ে করার পর তার সে নেশা কেটে গেছে। সুমিত্রাকে কথা দিয়েছিল, এবার থেকে ভালো হবে।

কেতকীকে দেখতে ভালো নয়। আলাদাভাবে বিচার করলে তার শরীরের কোনো অংশটাই সুন্দর বলা যায় না। তবু, সব মিলিয়ে তার বেশ একটা আকর্ষণ আছে। তার শরীর থেকে

যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার নাম মোহ। এই মেয়েটি এখানে একলা কেন থাকে? বাদলের পকেটে চাবি। সে যখন-তখন এখানে আসতে পারে। ঘুমন্ত মেয়েটিকে চুমু খেতে পারে!

এইকথা ভেবেই, অভিজিতের মনে ঠিক হিংসে নয়, হঠাৎ অসম্ভব রাগ হয়। পৃথিবীর কোনো মেয়েকেই অন্য কেউ ভোগ করছে এটা সে সহ্য করতে পারে না। সমস্ত মেয়েই শুধু তার জন্য কেন অপেক্ষা করে থাকবে না। কেন তার কথা শুনবে না?

অভিজিৎ মেয়েটির দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে রইল। ফাঁকা ঘর, শুধু তার সামনে একটি মেয়ে–এ-রকম অবস্থায় পড়লে গা ছমছম করে।

বাদল তার সামনেই মেয়েটিকে চুমু খেল। কোনোরকম লজ্জা বা লুকোচুরি নেই। আবার ইচ্ছে করেই যেন মেয়েটির কাছে তাকে একা রেখে গেল। এর মানে কী?

তুমি আমার পাশে এসে একটু বসবে! নিজের গলার স্বর শুনে অভিজিৎ নিজেই চমকে গেল। কীরকম যেন, রুক্ষ আর গোঁয়ারের মতন।

কেতকী কিন্তু চমকাল না। হাত তুলে সে চুল আঁচড়াচ্ছিল। তার উদ্ধত বুকে আঁচলটা এমনভাবে লেগে আছে যেন যেকোনো মুহূর্তেই খসে পড়বে, অথচ পড়ছে না। তার পেটের কাছে অনেকটা অংশ নগ্ন। রীতিমতন চর্বিজমা পেট, বেঁটে মেয়েদের এ-রকমই হয়, অথচ দেখতে খারাপ লাগছে না।

কেতকী অভিজিতের পাশে এসে বসে পড়ে বলল, এই তো বসলাম।

তুমি কে?

আমার নাম কেতকী।

তা তো বুঝলাম। তুমি এখানে একলা থাক?

আর কে থাকবে?

তোমার আর কেউ নেই?

হ্যাঁ। অনেকে আছে, কত বন্ধু, কত চেনা, কত তোমার মতন হঠাৎ চেনা, এমনকী আমার একটি স্বামীও আছে। সে-ও আসে মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে? অন্য সময় তুমি একলা থাক?

অন্য কেউ কেউ সঙ্গেও থাকে।

হঠাৎ যদি তোমার স্বামী এসে পড়ে?

কেন, সে হঠাৎ আসবে কেন? আর এলেই-বা কী?

বাদল তোমার কে হয়?

ধরে নাও বন্ধু।

অভিজিৎ কেতকীর কাঁধে হাত রেখে বলল, এ-রকম দুপুর বা বিকেলে এসে তোমাকে যদি কেউ মেরে রেখে যায়? আদর করতে করতে ঘাড় মুচড়ে দেয়?

কেতকী তবুও চমকাল না। হাসতে হাসতেই বলল, ওসব কী অলক্ষুণে কথা! আমায় মারবে কেন? আমি কি কারুর কোনো ক্ষতি করেছি?

অভিজিৎ বেশ শক্ত করে দু-হাতে কেতকীর মাথাটা ধরে কাছে টেনে এনে খুব গভীরভাবে চুমু খেল।

কেতকী একটুও আপত্তি করল না, চিরুনিটা খসে গেল হাত থেকে। এক হাতে সে গলা জড়িয়ে ধরল অভিজিতের।

কেতকীর ঠোঁট অসম্ভব গরম। অভিজিৎ রীতিমতন চমকে উঠেছিল। এতটা সে আশাই করেনি। জোর করে কোনো মেয়েকে চুমু খেলে সে ঠোঁটকে মনে হয় ভিজে রবার। অভিজিৎ কেতকীকে একটু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কেতকী বলল, তুমি গোড়া থেকেই এত রেগে আছ কেন গো? আমি তোমার নাম দিচ্ছি রাগিবাবু।

এক্ষুনি বাদল আসবে।

আসুক না!

তুমি বাদলের নিজস্ব মেয়ে, তুমি আমার কেউ নয়।

আমি কারুর কেনা বাঁদি নই গো রাগিবাবু!

অভিজিৎ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে নিজের ঠোঁট মুছল। একটু আগে বাদল যাকে চুমু খেয়েছে, সেই এঁটো ঠোঁটে সে মুখ দিয়েছে। এক সময় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশে এ-রকম সে অনেক করেছে। তখন সে ভাবত, অমৃত কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না। এখন সে-কথা মনে হচ্ছে না।

উঠলে কেন, বোসো।

আমি অন্য জায়গায় বসছি।

কেতকী এবার হাসতে হাসতে ঢলে পড়ল। তারপর বলল, তুমি দেখছি সত্যি সত্যি অদ্ভুত! তোমার বন্ধু বলে গেল তোমাকে খাতির করতে আর তুমি এ-রকম পরপর ব্যবহার করছ কেন?

আমি খুব খারাপ লোক।

তুমি কীরকম লোক আমি এক পলকেই বুঝেছি। আমরা লোক চিনি।

সোফার তলায় উঁকি মেরে কেতকী চিরুনিটা খুঁজল। তারপর অভিজিতের দিকে তাকিয়ে বলল, চিরুনিটা তোমার পায়ের দিকে, তুলে দাও তো–

অভিজিৎ চিরুনিটা তুলে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। এবার কেতকী উঠে দাঁড়িয়ে আবার চুল বাঁধতে বাঁধতে বলল, যেতে-আসতে তোমার বন্ধুর অন্তত পনেরো মিনিট লাগবে। তা ছাড়া ও বোধহয় ইচ্ছে করেই দেরি করে আসবে।

কেন?

তোমার জন্যে, বুঝলে বোকারাম!

না।

বেশ তো! তাহলে চুপচাপ বসে থাকো। শুধু শুধু দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছ কেন?

অভিজিৎ আবার কেতকীর কাঁধে হাত রাখল। বাদল কি তাকে সত্যিই এইজন্যে এখানে নিয়ে এসেছে? এতে বাদলের লাভ কী?

এবার অভিজিৎ চুমু খাবার বদলে কেতকীর ঠোঁটটা কামড়ে দিল। একই সঙ্গে তার লোভ এবং রাগ দুটোই হচ্ছে। কেন এত সহজে একটি মেয়েকে পাওয়া যায়? চেনা নেই শোনা নেই মাত্র দশ মিনিটের পরিচয়। তাতেই সে মেয়েটিকে চুমু খেতে গেল, আর মেয়েটি একটুও আপত্তি করল না। এর মানে কী। টাকাপয়সাতেই সব কিছু এত সহজ হয়ে যায়?

আমার ইচ্ছে তোমার ঘাড়টা ধরে মুচড়ে দিই। দেব?

কেন বার বার ও কথা বলছ? আমি কী দোষ করিচি?

বাদল কেন তোমাকে আগে চুমু খেল?

আ মরণ! সাধে কী তোমার নাম দিয়েছি রাগিবাবু?

অভিজিৎ আবার কেতকীকে ছেড়ে দিয়ে দূরের সোফাটায় বসে রইল। ঘাড় গোঁজ করে, অনেকটা অভিমানী শিশুর মতন। কেতকীর সঙ্গে আর একটাও কথা বলল না।

বাদল ফিরল বেশ খানিকটা পরে। একটা বড়ো বোতল, আর সঙ্গে কিছু খাবার।

কৈফিয়তের সুরে সে বলল, কাটলেটগুলো ভাজিয়ে আনতে দেরি হয়ে গেল।

তারপর এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বলল, কেতকী কোথায়?

ঘরে তখন অভিজিৎ একলা, কেতকী পাশের ঘরে সম্ভবত শাড়ি বদলাচ্ছে।

বাদল বিরক্তভাবে বলল, দেখেছ? মেয়েটা বুঝি তোকে একলা বসিয়ে রেখে গেছে? কেতকী?

বন্ধ দরজার ওপার থেকে যেন বহুদূর থেকে শোনা গেল, আসছি, তোমরা বোসো।

কেতকীর জন্যে ওরা আর অপেক্ষা করল না। বাদল নিজেই রান্নাঘর থেকে গেলাস আর জলের বোতল নিয়ে এল। গেলাসে ঢালার সঙ্গে সঙ্গে অভিজিৎ চুমুক দিয়ে অনেকখানি খেয়ে ফেলল। ঠিক বুভুক্ষুর মতন। অনেকক্ষণ ধরে তার শরীর ঠিক এটাই চাইছিল। যখনই তার চিন্তাধারায় গোলমাল হয়ে যায়, তখনই অভিজিতের মদের খুব বেশি দরকার হয়।

দুপুরে অফিসে গিয়েই সে একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছিল। সাহসের সঙ্গেই সে সেই সমস্যাটার মুখোমুখি হতে চায়। তার চেষ্টায় যদি অসীম আর তিন জনের চাকরি বাঁচে, তাহলে সে চেষ্টা সে করবেই। কিন্তু কেন রতনলাল চাড্ডার সঙ্গে রাত দশটার আগে দেখা করা যাবে না। সেই রাত দশটা পর্যন্ত তাকে বাদলের সঙ্গে কাটাতে হবে।

সুমিত্রাকে কথা দিয়ে এসেছে যে আজ ঠিক সময় ফিরবে। সে আজ নিজে বাজার করেছে। আর সুমিত্রা রান্না করেছে। আজ কথা রাখতেই হবে। আজ বেশি নেশা করাও চলবে না। তার কি নেশা হয়েছে? না, না, তেমন কিছু না।

এক কাজ করলে হত না? এক্ষুনি যদি সে বাড়ি ফিরে যায়? স্নান-টান করে, পোশাক পালটে, খাওয়া-দাওয়া সেরে সে যদি আবার এসে বাদলের সঙ্গে দেখা করে? তাহলে সুমিত্রার কাছে কথা রাখাও হবে, আর অফিসের কাজটাও করা যাবে। সেটাই বেশ ভদ্রলোকের মতন ব্যাপার হয়। সেটাই অভিজিৎ করবে। একটা কোনো অজুহাত দেখিয়ে বাদলের কাছ থেকে কেটে পড়বে। তবে এক্ষুনি নয়, আর খানিকটা পরে গেলেও চলবে।

এখন মাত্র সাড়ে পাঁচটা বাজে। বোতলটা যখন ধরেছেই, আর একটু খেয়ে নিলে ক্ষতি কী?

কেতকী সত্যিই শাড়ি বদলাতে গিয়েছিল। একটা ঝলমলে লাল রঙের শাড়িতে তার চেহারাটা অনেকটা বদলে গেছে। যেমন চুল বেঁধেছে, মুখে ক্রিম ঘষেছে, এখন আর তাকে ঠিক আগের মতন দেখাচ্ছে না।

বাদল তাকে বলল, নাও, তোমার জন্যে কাটলেট এনেছি।

কাটলেটের এক টুকরো ভেঙে মুখে পুরে কেতকী বলল, কোথাও বেড়াতে যাবে?

বাদল বলল, বেড়াতে? কোথায়?

চলো না, বাইরে যেকোনো জায়গা থেকে একটু ঘুরে আসি

ধুর

তাহলে এই সন্ধ্যে বেলা বসে বসে শুধু মদ গিলবে নাকি?

তা ছাড়া আবার কী করব?

তাহলে তোমরা থাকো, আমি ঘুরে আসি, একাই যাই বাবা! আমি সারাদিন ঘরের মধ্যে থাকি, আমার বুঝি ভালো লাগে?

তা সকালে বেড়াতে গেলেই পারতে? সকালে তো আমরা আসি না।

শোন কথা! সকালে আবার কোথায় বেড়াতে যাব?

বাদল কেতকীর কোমর ধরে কাছে টেনে বলল, এই, তুমি আমার বন্ধুকে খাতির যত্ন করোনি কেন? জান, ও একটা অফিসের ম্যানেজার, ফেলনা নয়?

কেতকী বলল, তোমার বন্ধু যা রাগি, আমাকে গ্রাহ্যই করছে না। এতক্ষণ ধরে তো একটা কথাও বলেনি আমার সঙ্গে।

অভিজিৎ রাগি? হা-হা-হা! ও আবার রাগি হল কবে থেকে? ও আসলে একটু লাজুক।

অভিজিৎ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। কেতকীর কোমরে বাদলের হাত, সে সহ্য করতে পারছে না। যেন বাদলের কোনো অধিকার নেই। অভিজিৎ আবার গেলাসে বড়ো চুমুক দিল।

হঠাৎ সে বলল, এক কাজ কর-না বাদল, তোরা দুজনে একটু বেড়িয়ে আয়। আমিও একটু অন্য জায়গা থেকে ঘুরে আসি। আমার একটা কাজও আছে। বলেই সে বুঝল যে ভুল করেছে। এরকমভাবে যাওয়া যায় না। এখন ওরা ভাববে, ওদের আলাদা থাকার সুযোগ দেওয়ার জন্যেই যেন অভিজিৎ চলে যেতে চাইছে। ওরা ছাড়বে কেন?

বাদল বলল, কাজ? তখন যে তুই বললি, রাত দশটা পর্যন্ত তোর কোনো কাজ নেই!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একবার টালিগঞ্জে যেতে হবে–

গুলি মার! মাল-ফাল খেয়ে এখন আবার কাজ? কাজ তো হবে সেই দশটার সময়। কেন, কেতকীকে তোর ভালো লাগছে না? কেতকীকে তোর পছন্দ হয়নি? কেতকী কিন্তু খুব ভালো মেয়ে। ওর শরীরে রাগ বলে কোনো বস্তু নেই।

আগে তো এর কথা শুনিনি!

এই তো বছর খানেক হল বন্ধুত্ব হয়েছে।

অভিজিৎ চুপ করে গেল। বাদল যেন ঠিক তার মনের কথাটাই বুঝে ফেলে বলল, তুই বুঝি ভাবছিস, আমি অনেক টাকাপয়সা দিয়ে ওকে রেখেছি? মোটেই তা নয়। কেতকীর যথেষ্ট টাকা পয়সা আছে, নিজের রোজগারও আছে। কেতকী আমাকে ভালোবাসে।

অভিজিৎ আরও রেগে গেল। কেন বাদল এমন অনায়াসে ভালোবাসার কথা বলবে? কেতকীকে ভালোবাসার ও কে?

অভিজিৎ বলল, আমার সত্যি একটা কাজ আছে। ঘুরে আসব আবার।

কেতকী বলল, কেন, আমাকে বুঝি আপনার পছন্দ হচ্ছে না? আমি দেখতে ভালো নই?

না, না, কী আশ্চর্য সে-কথা নয়!

তবে আপনি চলে যেতে চাইছেন কেন?

সত্যি আমার একটা কাজ আছে।

এতক্ষণ মনে পড়েনি, এখন মনে পড়ল? জানি, অনেক সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আমি অতি সাধারণ, সামান্য একটা মেয়ে, আমার সামনে বসে থাকতেও আপনার ভালো লাগছে না।

আরে কী আশ্চর্য! এ-রকম কথা তো আমি ভাবিইনি একদম।

তা হলে আপনি এসে আমার পাশে বসুন।

অভিজিৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার তাড়াতাড়ি এসে কেতকীর কাছে বসল। বাদল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসছে।

অভিজিৎ এই হাসির মর্মও বুঝতে পারল না। বাদল তার অনেক দিনের বন্ধু-কিন্তু এখন যেন কীরকম অচেনা হয়ে গেছে। সে চাবি দিয়ে একটা ফ্ল্যাটের দরজা খুলে তার ভেতরের একটি ঘুমন্ত মেয়েকে চুমু খায়।

বাদল বলল, দে অভিজিৎ, তোর গেলাসটা দে। খালি হয়ে গেছে দেখছি। কেতকী, তুমি একটু মাল খাবে না?

অভিজিৎ বুঝল, এক্ষুনি তার ওঠা হবে না! যাক খুব একটা তাড়া তো নেই। আরও আধঘণ্টা পর আর একবার চেষ্টা করব। তখন বাদলের খানিকটা নেশা হয়ে যাবে। আর বাধা দেবে না। অথচ তখন যে অভিজিতের নিজেরও বেশি নেশা হয়ে যাবে। সেটা তার খেয়াল রইল না।

বাদল বলল, এই ফ্ল্যাটটা কার জানিস? বাবুভাইয়ের।

অভিজিৎ বলল, বাবুভাই? সে তো মুম্বাই-এর লোক?

তা মুম্বাই-এর লোকের কি কলকাতায় ফ্ল্যাট থাকতে নেই? যারা বড়ো ব্যবসা করে তাদের সারাদেশেও সব বড়ো বড়ো শহরেই একটা করে ফ্ল্যাট থাকে। হোটেলের বদলে ফ্ল্যাটেই সুবিধে।

অভিজিতের মনে পড়ল, মিস্টার রক্ষিত আজই বলেছেন, বাবুভাই একজন ভারতবিখ্যাত চোর। তার টাকাতেই বিয়ার ফ্যাক্টরি হবে। তার টাকারই একটা অংশ অভিজিৎকে বাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে, তাহলে চারটি ছেলের চাকরি বাঁচানো যাবে। কিন্তু এখানেও

বাবুভাই? এই ফ্ল্যাটে? তাহলে এখানে কেতকী কী করে? কেতকী কি আসলে বাবুভাইয়ের রক্ষিতা?

অভিজিৎ বলল, বাবুভাই এখানে কখন আসেন? ওনার সঙ্গে একটু আলাপ করা যায় না।

বাদল অবাক হয়ে বলল, বাবুভাই তো এখানে আসে না কখনো। কলকাতাতেই আসে দু তিন বছরে একবার!

তাহলে এই ফ্ল্যাট রেখেছে কেন?

রেখেছে কাজের জন্য!

অভিজিৎ ভাবল এর মানে কী? কে এই রহস্যময় বাবুভাই! বাদল নিখিল কেতকী রতনলাল চাড্ডা যেন তাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। অভিজিৎকেও সেই বৃত্তে যোগ দিতে হবে। হঠাৎ অভিজিতের গা ছমছম করে। সে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে।

বাদল বলল, আমার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাইরে থেকে এলে আমি তো এখানেই থাকার ব্যবস্থা করে দিই। আমার চাবিটা দিয়ে দিই। তারা কেউ কেউ–কথাটা শেষ না করে বাদল কেতকীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

অভিজিৎ বলল, কেতকী বুঝি তোর কোনো ব্যাপারেই আপত্তি করে না?

না! ও তো খুব ভালো মেয়ে। তা ছাড়া কী জানিস, হিংসে বলে কোনো কিছু ওর মধ্যে নেই, আমারও নেই। ঈর্ষা-ফির্সার ব্যাপারগুলো আমরা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেছি!

এটা খুব একটা নতুন কথা শুনছি।

বড়ো কোনো কাজ করতে গেলে মেয়েমানুষ নিয়ে হিংসে করলে চলে না!

এখানে কোন বড়ো কাজটা হচ্ছে শুনি?

টের পাবি, আস্তে আস্তে টের পাবি।

আমি তোমার ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না!

নে, গেলাস শেষ কর।

বাদল, তুই কবে থেকে এত মদ খেতে শিখলি রে? আগে তো এত খেতে দেখিনি কখনো!

বাদল বলল, তুই-ই তো আমাদের শিখিয়েছিস অভি! তুই ছিলি এ লাইনে আমাদের গুরু!

অভিজিৎ কিছু না বলে হাসল।

বাদল বলল, বোস, আমি আসছি বাথরুম থেকে।

কেতকী সেই যে বেড়াতে যাবে বলে শাড়ি বদলে এসে দাঁড়িয়েছিল এখনও সেইরকমই দাঁড়িয়ে আছে, বসেনি।

বাদল বাথরুমে যাওয়ার পর অভিজিৎ তাকে বলল, দাঁড়িয়ে কেন, বোস।

কেতকী তার পাশের চেয়ারে এসে বসল।

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, বাবুভাইয়ের ফ্ল্যাট, অথচ সে কখনো আসে না। তুমি..তুমি তাহলে এখানে থাকো কেন? তুমি বাবুভাইয়ের কে?

.

আমি আবার কে? এটা বাবুভাইয়ের অফিস, আমি সেই অফিসে কাজ করি।

এটা অফিস?

হ্যাঁ! মাঝে মাঝে মাল আসে, সেটা আমার কাছে রাখি, আবার লোক এলে তার হাতে দিয়ে দিই।

অফিসের কোনো সাইনবোর্ড নেই কেন? যারা মাল কিনতে আসবে, তারা চিনবে কী করে?

এখানে যারা মাল নিতে আসে, তারা সবাই চেনা লোক।

কী মাল?

তুমি বাপু অত কথা জানতে চেয়ো না। তুমি নতুন লোক তোমার এসব কথার দরকার কী? ফুর্তি করতে এসেছ ফুর্তি করো–

অভিজিৎ রক্তাক্ত চোখে তাকাল কেতকীর দিকে। তার নেশা চড়ে গেছে, মুখে তেলতেলে ভাব ফুটে উঠেছে। এখন নিজেকে মহাশক্তিমান মনে হয়!

সে আদর করার জন্যে হাত বাড়িয়ে কেতকীর গায়ে তার সব কটা নখ চেপে ধরল। কেতকী বলল, উঃ লাগছে। তারপর অভিজিৎকে প্রলুব্ধ করার জন্য কেতকী বুকের আঁচল ইচ্ছে করে ফেলে দিল।

অভিজিৎ বলল, তোমাকে আমি খুন করব।

তা খুন করতে হয় তো করো না। তখন থেকে বার বার এককথা বলছ কেন?

সত্যি তোমার ঘাড়টা মুচড়ে দেব?

কেন রে বাপু? আমি কী দোষ করেছি?

অভিজিৎ একথার ঠিক উত্তর দিতে পারল না। হাতের গেলাসটা কেতকীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, খাও!

খাচ্ছি তো! এই তো আমার গেলাস আছে।

না। এর থেকে খাও, খেতেই হবে!

অভিজিৎ এত জোরে চিৎকার করল যে, ঘরের ভেতরটা গমগম করে উঠল। সে যেন পাগল হয়ে গেছে। নিজের গেলাসটা জোর করে কেতকীর মুখের ওপর চেপে ধরে আবার হুংকার দিয়ে বলল, খাও! ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে কেতকী শান্তভাবে বলল, এই তো খেলাম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বাদল বলল, কী হয়েছে?

কেতকী বলল, কিছু হয়নি তো।

তাহলে অভিজিৎ এত রাগারাগি করছিল কেন?

অভিজিৎ হাসবার চেষ্টা করে বলল, কই রাগিনি তো? কেতকীকে একটু আদর করছিলুম -তুই যে বললি তোর কোনো হিংসে নেই?

তারপর বাদলকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়ে সে লাফিয়ে উঠে বলল, আমিও একটু বাথরুমে যাব।

কয়েক পা গিয়ে সে আবার ফিরে এসে নিজের গেলাসটা শেষ করে দিল এক চুমুকে। তারপর বাথরুমের দরজা বন্ধ করে সশব্দে জলের কলটা খুলে দিল। তারপর বাথরুমের দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে চোরের মতো লুকিয়ে দেখতে লাগল, বাদল আর কেতকী এখন কী করে!

ওরা জড়াজড়ি করবে কিনা সে-সম্পর্কে অভিজিতের আগ্রহ নেই, সে জানতে চায়, বাদলের কাছে কেতকী তার নামে কিছু লাগায় কিনা-কেতকীর ঘাড়ে সে নখ বসিয়ে দিয়েছে।

ওরা জড়াজড়িও করল না, কোনো ব্যাপারে উত্তেজিত হতেও দেখা গেল না।

দু-জনে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে কী যেন, বলাবলি করতে লাগল। অভিজিতের নামে নিশ্চয়ই নয়, তাহলে নিশ্চয়ই এদিকে একবার তাকাত। ওদের এমন সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গি যে, ঠিক যেন মনে হয় স্বামী-স্ত্রী। অভিজিৎ বেশ খানিকটা নিরাশা বোধ করল।

আবার সে যখন বেরিয়ে এল, তখনও তাকে দেখে কেতকী বা বাদল হঠাৎ কথা থামিয়ে দিল না। ওরা কোন এক ইলেকট্রিক মিস্তিরি সম্পর্কে কথা বলছিল।

কী করে যে সময় কেটে যায়, বোঝা যায় না। অভিজিৎ ঘড়িতে দেখল সাড়ে সাতটা বাজে। এখনও বাড়ি চলে যাওয়া যায়। তাহলে দশটার মধ্যে ঠিক ঘুরে আসতে পারবে। বোতলটায় আর বেশি নেই, শেষ করতে আর মিনিট পনেরো-কুড়ি লাগবে। ওটুকু ফেলে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। অভিজিৎ আবার গেলাসটা বাড়িয়ে দিল।

বোতল শেষ হওয়ার আগেই দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

বাদল বলল, কে এসেছে আবার?

কেতকী বলল, আমি দেখছি।

ঝুটঝামেলার পার্টি এলে এখন হঠাও! এখন যেন এখানে কেউ না আসে।

চাকরটা ছুটি নিয়েছিল বোধ হয় সে-ই ফিরে এসেছে। না, চাকর নয়, অন্য কেউ নয়, নিখিল। এয়ারপোর্ট থেকে মালপত্র নিয়ে সোজা এখানে চলে এসেছে।

বাদল বলল, তুই এরমধ্যেই ফিরলি!

নিখিল বলল, প্ল্যান স্যাংশন হয়ে গেছে। খুব সহজেই কাজ হয়ে গেল। এবার রতনলালের সঙ্গে বসে

অভিজিৎকে দেখে নিখিল বলল, তুই এসেছিস? বা:! খুব ভালো হয়েছে। সেদিন তোর সঙ্গে ভালো করে কথাই হল না।

অভিজিৎ খানিকটা ঘোলাটে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল নিখিলের দিকে। এই তার বন্ধু নিখিল, একসময় কত ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন তার কত ব্যস্ত, দায়িত্বপূর্ণ গম্ভীর ভাব। ভালো করে অভিজিতের দিকে চেয়েই দেখল না!

অভিজিৎ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, এই নিখিল! শালা—

নিখিল চমকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, কী!

অভিজিৎ বলল, তুই এত পোজ মারছিস কেন?

তাই নাকি? কই? তুই আমার পোজ কী দেখলি?

অভিজিৎ আবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। হাত নেড়ে বলল, না, না, কিছু না, এমনিই

কেতকী নিখিলের হাত থেকে কোটটা নিয়ে শোয়ার ঘরে ঝুলিয়ে দিতে গেল। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, তুমি চা-টা কিছু খাবে? দুপুরে কখন খেয়েছ?

নিখিল বলল, ওসব লাগবে না। এয়ারপোর্ট থেকে সবে খেয়ে-টেয়ে এসেছি।

বাদল বলল, মালও তো ফুরিয়ে গেছে। দাঁড়া, একটা বোতল নিয়ে আসি!

নিখিল তাকে বাধা দিয়ে বলল, যেতে হবে না। আমি শিলং-এর ক্যান্টিন থেকে দু-বোতল ভালো হুইস্কি এনেছি, খুব সস্তায়।

হাতের ঝোলাটা বাদলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নে খোল, আমি চট করে একটু চান করে নিই আগে। বোস অভিজিৎ, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।

অভিজিতের আর বাড়ি ফেরা হল না। নতুন বোতলটা খোলার পর তার আর বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ল না। এখন অভিজিতের কথা রীতিমতো জড়িয়ে এসেছে। কেতকীর দিকে যতবার চোখ পড়ছে, সে কটমট করে তাকাচ্ছে। বাদলের অসাক্ষাতে সে আরও একবার কেতকীকে বলল, তোমাকে আমি খুন করব।

কেতকীর ওপর কেন যেন, ক্রমশ রাগ বেড়ে যাচ্ছে, সে নিজেই বুঝতে পারছে না।

নিখিল স্নান করে সেজেগুজে এসে যখন বসল, তখন অভিজিৎ সোফার একপাশে কাত হয়ে পড়েছে। নিখিল তাকে একটা খোঁচা মেরে বলল, এই, ওঠ! এরমধ্যেই শুয়ে পড়লি কেন?

অভিজিৎ কষ্ট করে উঠে বসল। নিখিল বলল, শোন, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আমাদের প্রোজেক্টটার কাজ শিগগির শুরু হবে!

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, কীসের প্রোজেক্ট?

বাঃ, তোর মনে নেই? সেদিন যে বললাম? বিয়ার ফ্যাক্টরি..শিলং- এ

বিয়ার ফ্যাক্টরি? বিয়ার ব্রুয়ারি! হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ

হাসছিস কেন? এতে হাসির কী আছে?

বিয়ার ফ্যাক্টরি? না, বিয়া-র ব্রুয়ারি।

সে যাইহোক, এটা পাবলিসিটির ব্যাপার

অভিজিৎ নিখিলের কথা কিছুই শুনছে না। জড়ানো গলায় বলতে লাগল, বি-য়ারি ব্রু য়্যারি! হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ

এর পাবলিসিটি ক্যাম্পেনের জন্যে তোকে বলেছিলাম

অভিজিৎ মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বলল, পাবলিসিটি? কি-স্যু লা-গ-বে-না। লোকে এমনি খেয়ে নেবে। কেন পা- ব-লি-সি-টির জন্যে পয়সা খরচ করবি? আমিই তো সব খেয়ে নেব! হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।

নিখিল সামান্য ধমক দিয়ে বলল, কী হচ্ছে অভিজিৎ, কথাটা শোন মন দিয়ে।

অভিজিৎ প্রবলভাবে হাসতে হাসতে বলল, শুনেছি তো? বিয়ারের আবার পাবলিসিটি! মদের কখনো...মদের কখনো পাবলিসিটি লাগে? সবাই তো এমনি এমনি...সবাই তো খেয়ে নেয়! কে মদ খায় না, বল? গলি গলি মে গোরস ফিরে, মদিরা বৈঠে বিকায়। জানিস না? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

বাদল বলল, এঃ অভিজিৎটা একদম আউট হয়ে গেছে।

অভিজিৎ অমনি খাড়া হয়ে বসে বলল, আউট? আমি আউট? কোন শালা বলে আউট?

বাদল আর নিখিল ওকে আর পাত্তা দিল না। নিজেদের গেলাসে মনঃসংযোগ করল। অভিজিৎও আর থামতে পারল না। হ্যাংলার মতন বার বার গেলাসটা এগিয়ে দিচ্ছে। নিখিল একবার মৃদুভাবে বলল, অভি, তুই আর খাসনি!

বেশ করব খাব! কেন খাব না?

নিখিল আবার তাকে অগ্রাহ্য করে বাদলের দিকে তাকিয়ে বলল, কাল সকালে বাবুভাইকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। তোর চেনা কোনো উকিল আছে?

কেতকী হঠাৎ বলে উঠল, উঃ, দেখো তো, আমায় তখন থেকে কীরকম জ্বালাচ্ছে? আমার বুঝি ব্যথা লাগে না? ছাড়ো!

অভিজিৎ কেতকীর একটা হাত পেছন দিয়ে মুচড়ে ধরে আছে। চাপা গলায় বলল, খুন করব তোমাকে! একদম শেষ করে দেব।

নিখিল বিরক্তভাবে বলল, এই অভি, কী-কী করছিস? ছেড়ে দে ওকে। ও তোর কী ক্ষতি করেছে?

বাদল বলল, আজ অভিজিৎটার মেজাজ ভালো নেই। দুপুর থেকে দেখছি।

খুব ভালো মেজাজ! কে বলল, মেজাজ ভালো নেই?

তাহলে ওকে ছেড়ে দে।

না ছাড়ব না।

বাদল একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে অভিজিৎকে সরিয়ে দিল কেতকীর কাছ থেকে।

অভিজিৎ বলল, কী রে। তখন যে বললি তোর ঈর্ষা নেই? তাহলে এখন চটে যাচ্ছিস কেন?

নিখিল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সাড়ে নটা বাজল, চল, রতনলালের কাছে যেতে হবে। অনেক কথা আছে।

অভিজিৎ ওঠার চেষ্টা করে বলল, আমিও যাব।

বাদল বলল, থাক, তোকে আজ আর যেতে হবে না।

অভিজিতের মুখখানা হঠাৎ খুব ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অভিমানের সঙ্গে বলল, আমি যাব না? সারাসন্ধ্যে এইজন্যে বসে রইলাম?

নিখিল বলল, তোকে এই অবস্থায় আমরা নিয়ে যেতে পারি না। বাদল বলল, এখন ও গেলে কী উলটোপালটা বলে ফেলবে সব কেঁচিয়ে যাবে।

অভিজিৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। নিখিলের হাত জড়িয়ে বলল, নিখিল, তুই আমাকে নিয়ে যাবি না? আমি তোর কত দিনের পুরেনো বন্ধু, তুই আমাকে নিয়ে যাবি না? পাবলিসিটির কাজটা আমার ভীষণ দরকার! ওই কাজটার জন্য চার জনের... চার জনের..বুঝলি চার জনের...অভিজিৎ কাঁপতে লাগল।

নিখিল বলল, সেই পাবলিসিটির কথাটাই তো তোকে বলতে চাইছিলাম। তুই তো শুনলিই না।

হাতের উলটোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে অভিজিৎ বলল, চল, রতনলালের কাছে গিয়ে কথাটা পাকা করে আসি।

আজ আর হবে না।

হবে না! কেন হবে না? বাদল সেইজন্যে আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখল। ও নিয়ে যাবে বলেছিল।

বাদল বিরক্তভাবে বলল, নিয়ে যাব তো বলেছিলাম। কিন্তু তুই শালা এরকম মাতাল হয়ে গেলি কেন? রতনলাল একদম মাতলামি পছন্দ করে না।

কে মাতলামি করছে? আমি? একবার বাইরে গেলেই ফিট হয়ে যাব। অভিজিৎ সেনগুপ্ত কোনোদিন আউট হয় না।

থাক ঠিক আছে, আর একদিন যাস নাহয়।

না, না, আর একদিন নয়...আজই...আমার ভীষণ দরকার–মাইরি বলছি, এই কাজটা – চল, এক্ষুনি চল–

এক পা এগোতে গিয়ে অভিজিৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

নিখিল বলল, আজ আর তুই কিছু পারবি না, তুই এখানেই শুয়ে থাক। কেতকী তোর দেখাশুনো করবে।

হাঁটু গেড়ে উঠে বসতে বসতে চিৎকার করে বলল, না।

বাদল তার হাত ধরে টেনে সোফায় বসিয়ে দিল। টেবিল থেকে একটা গেলাস তুলে নিয়ে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, নে আর একটু খা ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর বাদল নিখিলের দিকে চোখের ইশারা করে বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে–

পা টিপে বেরিয়ে গেল ওরা দুজন।

ঝন ঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দে অভিজিতের ঘোর ভাঙল। এরমধ্যেই তার একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, গেলাসটা হাত থেকে পড়ে গেছে।

দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে কেতকী বলল, ভাঙলে তো গেলাসটা?

বেশ করেছি!

আচ্ছা, বেশ করেছ, ভালো করেছ। এখন শুয়ে থাকো তো!

অভিজিৎ কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলে, ওরা কোথায় গেল?

চলে গেছে।

আমাকে নিয়ে গেল না শালারা! ঠিক আছে, আমি নিজেই যাব।

তুমি আজ আর কোথাও যেতে পারবে না! এখানেই থেকে যাও। চাকরটা এল না, কাকে দিয়ে যে, খাবার আনাই। খিচুড়ি রাঁধতে পারি, তুমি খাবে?

চোপ।

পাঁউরুটি আর জ্যাম দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে দেব?

অভিজিৎ মুখে একটা ঘৃণার ভঙ্গি করে বলল, এ, স্যাণ্ডউইচ, খিচুড়ি? দুর দুর দুর! ওসব ভদ্দরলোক খায়! আমি খাব কাঁকড়ার ঝোল আর গরম ভাত...

সে আমি কোথায় পাব?

তোমায় কে পেতে বলেছে? আমার...আমার বাড়িতে।

আজ তুমি এই অবস্থায় বাড়ি যেতে পারবে?

চোপ বলছি না! খুন করে ফেলব একদম। আমি তোমাকে খুন করে ফেলতে পারি জেনেও ওরা তোমার কাছে আমায় একা রেখে গেল যে? যদি সত্যিই খুন করি?

কেতকী কাছে এগিয়ে এসে বলল, তখন থেকে অত খুন খুন করছ কেন? আমি তোমার কী করেছি?

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে অভিজিৎ টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি বাড়ি যাব। তারপর একপাটি জুতো খুলে গিয়েছিল, সেটা আবার পরে নিল। পকেট চাপড়ে দেখল মানিব্যাগটা ঠিক আছে কিনা। তারপর অন্ধের মতন দরজার দিকে এগোল।

কেতকী তার সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে বলল, লক্ষ্মীটি, যেয়ো না। এই অবস্থায় তুমি কী করে যাবে? একটা অ্যাক্সিডেন্ট করবে শেষকালে? রাত্তিরটা থেকে যাও, সকালে যেয়ো।

চোপ! আমাকে কি খারাপ লোক পেয়েছ যে, তোমার মতন একটা মেয়েছেলের ঘরে রাত কাটাব?

কেতকী তবু ওকে জড়িয়ে ধরে অনুনয় করে বলল, আমি তোমায় একটুও জ্বালাতন করব না। তুমি ঘুমিয়ে থাকবে–বিছানা পেতে দিচ্ছি–

অভিজিৎ তাকে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল, খবরদার, ছোঁবে না আমাকে খুন করে ফেলব তা হলে।

কেতকী ওকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল, সে ক্ষমতাও তোমার নেই।

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল অভিজিৎ। কোনোরকমে দেওয়াল ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামল। রাস্তা এখন ফাঁকা, ট্যাক্সি পেতে অসুবিধে হল না।

সেই ট্যাক্সি নিয়ে অভিজিৎ খুঁজতে গেল রতনলালের বাড়ি। রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বর কিছুই এখন তার মনে নেই। ড্রাইভারকে বলল ডাইনে।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। একটু বাদে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, আভি কীধার?

অভিজিৎ বলল, বাঁয়া! বাঁয়া চলিয়ে।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ড্রাইভার আবার জিজ্ঞেস করতেই অভিজিৎ একবার বলতে লাগল ডাইনা একবার বাঁয়া। গাড়ি চরকির মতো ঘুরতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক এরকমভাবে ঘোরার পর এক সময় অভিজিতের মনে পড়ল বাড়ি যাওয়ার কথা। বাড়ির রাস্তা চিনতে ভুল হল না।

বাড়ির সামনে এসে ঠিক গুনে গুনে ট্যাক্সি ভাড়া দিল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে এমন ভাবে উঠতে লাগল যেন, তার আর একটুও নেশা নেই। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিল চাকর। অভিজিৎ তাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, বউদি কোথায়?

চাকর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল খাবার ঘরে। অভিজিৎ সেখানে উঁকি মেরে দেখল। খাবার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে সুমিত্রা।

অভিজিৎ তার পাশে গিয়ে মাথায় হাত রাখল।

চমকে মাথা তুলল সুমিত্রা। একদৃষ্টে স্বামীর দিকে চেয়ে রইল।

অভিজিৎ তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মুখে একটা ভয়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, আজ অফিসে সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেল। তোমাকে পরে বলব!

সুমিত্রা ঠাণ্ডাভাবে বলল, ঠিক আছে, শোবে চলো।

কেন, খাব না?

না, আজ আর খেতে হবে না।

সে কী? কাঁকড়া? কাঁকড়া খাব বলে ছুটতে ছুটতে এলাম।

এখন খেতে পারবে?

আলবাত পারব! তোমার রান্না কাঁকড়া খাব, বলে আজ বিকেল থেকে কিছু খাইনি। সত্যি বিশ্বাস করো

সুমিত্রা খাবার সাজিয়ে দিল। অভিজিৎ হাত-টাত না ধুয়েই, ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে লাগল। মাখছে তো মাখছেই। চোখে আবার ঘোর এসে যাচ্ছে। এক গরাস ভাত হাত ধরে আছে, মুখে আর তুলতে পারছে না।

সুমিত্রা সেদিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখে রাগ বা কষ্টর কোনো ছায়া নেই। যেন বরফের তৈরি মুখ। চোখেও পলক পর্যন্ত ফেলছে না। একসময় সে আবার শান্তভাবে বলল, বললাম তো, আজ আর খেতে পারবে না? উঠে পড়ো, হাত ধুয়ে নাও!

কেন খাব না। নিশ্চয়ই খাব।

টপাটপ দু-গেরাস ভাত পুরে দিল মুখে। তারপর অভিজিৎ বাটি থেকে সবেমাত্র একটা কাঁকড়ার দাঁড়া হাতে তুলে নিয়েছে, সেই সময় বমি করল। পিচকিরির মতন তার মুখ দিয়ে বমি ছুটে গিয়ে পড়ল সুমিত্রার গায়ে, সুমিত্রার ভাতের থালায়। অভিজিৎ হাত দিয়ে বমি আটকাতে পারল না, মুখ থুবড়ে পড়ল থালার ওপর।

৫. রবিবার সকাল

রবিবার সকাল। অভিজিৎ বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছিল, এমন সময় টেলিগ্রাম পিয়োন এল। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে অসীম, বেনারস থেকে। পরশুরাতে তার মা মারা গেছেন। আরও দু সপ্তাহের ছুটি চেয়েছে।

টেলিগ্রামটা অফিসে না পাঠিয়ে বাড়িতে পাঠাল কেন? সম্ভবত আজ রবিবার বলে। তা ছাড়া অসীম একসময় প্রায়ই এবাড়িতে আসত। সেইজন্যেই বোধ হয় খবরটা ব্যক্তিগতভাবে অভিজিৎকে জানাতে চেয়েছে।

ছেলেটা মাকে খুবই ভালোবাসত। এখন একেবারে একা হয়ে পড়ল। অভিজিৎ ছেলেবেলাতেই মাকে হারিয়েছে বলে অসীমের জন্যে খানিকটা দুঃখ বোধ করল।

এত বড়ো একটা আঘাত পাওয়ার পরও অসীমকে আর একটা আঘাত পেতে হবে। মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে অফিসে জয়েন করার পরই সে, বরখাস্তের চিঠি পাবে। আর তাকে বাঁচানোর কোনো উপায় নেই। মিস্টার রক্ষিত এক মাস সময় দিয়েছিলেন–এর মধ্যে আর কিছুই করা যাবে না। সেদিনের সেই গোলমালের পর অভিজিৎ আর বাদল কিংবা নিখিলের সঙ্গে দেখা করেনি। তবে বাদল ফোন করে জানিয়েছে যে, রতনলাল চাড্ডা শিলিগুড়ি চলে গেছে, এক সপ্তাহের মধ্যে আসবে না।

অসীমের বরখাস্তের চিঠিটা অভিজিৎকে সই করতে হবে। সে তো অফিসটার মালিক নয়, কারুকে ছাঁটাই করার অধিকারও তার নেই। তবু এইসব চিঠিতে তাকেই সই করতে হবে কেন? ভাবনাটা অভিজিতের মনে খচ খচ করে বেঁধে। তার পক্ষে এখন সবচেয়ে ভালো উপায়, এই চাকরিটা ছেড়ে ন্যাশনালে যোগ দেওয়া। লোকে তো ভালো সুযোগ পেলে এক চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি নেয়ই। এতে কেউ তাকে দোষ দেবে না। তাদের আপিসটার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। ফুটো নৌকো ছেড়ে সবাই পালাতে চায়!

পরপর ক-দিন অভিজিৎ ঠিক সময় বাড়ি ফিরছে। একটুও মদ্যপান করে না। সুমিত্রা প্রথম দু-দিন অভিজিতের সঙ্গে কথা বলেনি। দু-একদিনের ব্যাপারে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু অভিজিৎ আর ভুল করেনি। সুমিত্রার মান ভাঙিয়ে সে বলেছে, আমাকে আর একটিবার সুযোগ দাও-অন্তত একবার।

সুমিত্রা সেই সুযোগ দিয়েছে। ক-দিন তার মনটা খুশি আছে।

সুমিত্রা এসে জিজ্ঞেস করল, কার টেলিগ্রাম?

অভিজিৎ নিঃশব্দে লাল কাগজটা এগিয়ে দিল সুমিত্রার দিকে।

সুমিত্রার মুখে স্পষ্ট একটা দুঃখের ছায়া পড়ল। সেও চেনে অসীমকে বলল, আহা! বেশি তো বয়েস হয়নি!

অভিজিৎ নির্লিপ্তভাবে বলল, এর চেয়েও বেশি দুঃখ অসীমের কপালে আছে।

কেন?

অভিজিৎ পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল সুমিত্রাকে।

সুমিত্রার নরম মন। সমবেদনায় তার মুখটা কুঁকড়ে গেল প্রায়। সে কাতর গলায় বলল, ইশ! এমন অন্যায় মানুষের ওপর মানুষ করে? এই সময়ে ওকে আরও সাহায্য করা উচিত

অভিজিৎ গ্রীবা উঁচু করে বলল, এখন আমার কী করা উচিত বলতে পারো?

সুমিত্রা চট করে উত্তর দিতে পারল না।

অভিজিৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমার নিজের বাঁচার রাস্তা আছে। আমি অনায়াসে কালই চাকরি ছেড়ে দিতে পারি। আমাকে বেকার বসে থাকতে হবে না। দু-তিন জায়গা থেকে

আমার অফার আছে। সেসব জায়গায় আমি আর ম্যানেজার থাকব না অবশ্য, কিন্তু মাইনে একই থাকবে, কিছু বাড়তেও পারে।

সুমিত্রা বলল, ম্যানেজার না থাকাই ভালো। ম্যানেজারের যখন এত দায়িত্ব

ঠিক। তাহলে ন্যাশনাল থেকে তো আমাকে প্রায়ই ডাকাডাকি করছে, সেইখানেই ঢুকে পড়ি?

ন্যাশনাল তো এ বাড়ির থেকে আরও একটু কাছে-সেটাও ভালো হবে।

তাও ঠিক, প্রত্যেকদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারব। এটাই নিয়ে নিই, কী বলো?

নাও-না।

অভিজিৎ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল জোরে। সে হাসি থামতেই চায় না। হাসিটা সে একা একা উপভোগ করছে। সুমিত্রা কিছুই মানে বুঝতে পারল না।

পৃথিবীতে কতরকম মজা আছে। আমি যদি ন্যাশনালে যোগ দিই আমার দায়িত্ব কমবে কিন্তু মাইনে বাড়বে। আমি রোজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব। আর মদ খেয়ে মাতলামি করব না। সবাই বলবে অভিজিৎ আজকাল ভালো হয়ে গেছে। তুমিও খুশি হবে। কিন্তু কেউ জানতে পারবে না, পুরোনো অফিসে আমার জন্যেই চারটে ছেলের চাকরি গেছে। অন্তত আমি চেষ্টা করলে তাদের চাকরি বাঁচাতে পারতাম।

এজন্য আমাকে কেউ দোষ দেবে না, কী বলো?

সুমিত্রা তখনও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, তোমায় দোষ দেবে কেন? তোমার কি কোনো হাত আছে?

না নেই। কোম্পানিটা আমার নয়। ওদের চাকরি যাওয়ার জন্য আমি দায়ী নই। কিন্তু আমি এখনও চেষ্টা করলে ওদের চাকরি বাঁচাতে পারি।

তুমি সত্যিই ওঁদের চাকরি বাঁচাতে পারো?

হয়তো পারি। সেজন্যে আমাকে জোগাড় করতে হবে নতুন কনট্রাক্ট। তার জন্যে আবার আমাকে গিয়ে ধরাধরি করতে হবে, কয়েকটা চোর আর বদমাশকে। তোষামোদ করে পায়ে তেল দিতে হবে অনেকদিন। কোনটা ভালো বলতে পারো?

সুমিত্রা স্তম্ভিত হয়ে রইল।

অভিজিৎ নিষ্ঠুরের মতন বলল, তুমি পারো না। তুমি আমাকে পথ দেখাতে পারো না। তুমি শুধু চাও আমি ভালো হয়ে উঠি, কিন্তু বাইরের পৃথিবীটা কত নিষ্ঠুর জান না। ভালো হওয়া মানে স্বার্থপর হওয়া, তাই না? একটু আগে তুমি অসীমের জন্যে দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলে। তারপর আমি যেই আমার অন্য চাকরির কথা বললাম, তখন আর অসীমের কথা তোমার মনেও রইল না।

সুমিত্রা আস্তে আস্তে বলল, আরও তো কত লোক চাকরি করে, সবাইকে কি তোমার মতন এরকম খারাপ লোকের তোষামোদ করতে হয়? তাদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে মদ খেতে হয়?

আমাকে বাধ্য হয়ে মদ খেতে হয় না। অনেক সময় আমি ইচ্ছে করেই মদ খাই। যখন আমি কোনো সমস্যার উত্তর খুঁজে পাই না। খুব কষ্ট হয়, তখন মদ খেতে ভালো লাগে। কষ্ট হলে তোমরা মেয়েরা কাঁদো, কেঁদে নিজেদের খানিকটা হালকা করো, আমি তো তখন কাঁদতে পারি না।

সব চাকরিতে এত সমস্যা থাকে?

জিনিসটা এড়িয়ে যেয়ো না। আমি এখন শুধু আমার সমস্যার কথাটা বলছি, এই ছেলেচারটির ভবিষ্যৎ নষ্ট করে আমি বাঁচতে পারি, বাঁচতে পারতাম, যদি আমার বিবেক

বলে একটা-কিছু না থাকত! সারাজীবন আমার বিবেক খচ খচ করবে। রাস্তায়-ঘাটে অসীম কিংবা বাকি তিন জনের সঙ্গে কখনো দেখা হলে আমাকে পালিয়ে যেতে হবে!

এই সময় দরজায় বেল বাজল। সুমিত্রাই দরজা খুলে দিল। এবং অচেনা লোক দেখে বসতে বলে সে ভেতরে চলে যাচ্ছিল, অভিজিৎ তাকে ডেকে বলল, সুমিত্রা যেয়ো না, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, ইনি প্রকাশ রায়চৌধুরী, ন্যাশনাল সি-ডি-পি-র ম্যানেজার। আর প্রকাশদা, এই আমার স্ত্রী। আপনি তো আগে কখনো আসেননি আমার বাড়িতে।

প্রকাশ রায়চৌধুরী হাত তুলে সুমিত্রাকে নমস্কার করে বলল, এসেছিলাম এদিকে, তোমাদের এই রাস্তার মোড়েই মিসেস সোম থাকেন–তারপর ভাবলাম তোমার এখানেও একটু ঢুঁ মেরে যাই।

সুমিত্রার দিকে ফিরে বলল, কফি খাব কিন্তু। চিনি দেবেন না। রসগোল্লা সন্দেশ আনবেন না, এমনকী বিস্কুটও আমি খাচ্ছি না। শুধু কফি।

প্রকাশ রায়চৌধুরীর বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে, দারুণ মোটা চেহারা, প্যান্টের সঙ্গে বেল্ট পরেন, তবু বেল্ট ছাপিয়ে ভুড়ি বেরিয়ে আসছে। এরকম চেহারা হওয়া সত্ত্বেও চলাফেরায় বেশ একটা দ্রুততা আছে, সারাদিন ধরে অক্লান্তভাবে কাজ করতে পারেন। চুলে কলপ, বড়ো জুলপি, রঙিন জামা ছাড়া কিছু পরেন না।

সোফায় শব্দ করে বসে পড়ে বললেন, তুমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছ তাহলে?

অভিজিৎ ভুরু তুলে বলল, প্রকাশদা, আপনি কি অন্তর্যামী। কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করছি বটে, কিন্তু আমার স্ত্রী ছাড়া কারুকেই বলিনি এপর্যন্ত। আপনি জানলেন কী করে?

হাহা করে হেসে প্রকাশ রায়চৌধুরী বলল, অন্তর্যামীই বটে। আন্দাজে ঢিল ছুড়লাম। আর তুমি নিজেই ফাঁস করে দিলে!

আমি ভাবলাম, আপনি বোধ হয় এতক্ষণ আমাদের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনছিলেন।

ওটাই বাকি আছে এখনও। পরের বাড়ির দরজায় উঁকি মারার। তোমার কোম্পানির অবস্থা তো বেশ খারাপ শুনছি।

কিছুদিন একটু খারাপ চলছে।

বেশ তো, ওটা ছেড়ে তুমি ন্যাশনালে জয়েন করো, তোমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পোস্ট দেওয়া হবে।

আর দু-চারদিন ভেবে দেখি।

শোনো, আমি নিজে মালিকদের কাছে তোমার নাম প্রস্তাব করেছি। মালিকরা অবশ্য তোমায় চেনে। এককথায় তারা রাজি হয়েছে। টাকাটা তুমি এখানে অনেক বেশি পাবে–সুতরাং তোমার আর আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না।

প্রকাশদা, তবু আমি একটু ভেবে দেখতে চাই!

আর ভাবাভাবির কিছু নেই। চলে এসো। রতনলাল চাড্ডার ওপর তোমার নাকি খুব হোল্ড আছে। ওদের নতুন কাজটা তুমি যদি আমাদের কোম্পানিতে আনতে পারো

অভিজিৎ প্রকাশ রায়চৌধুরীর মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল। প্রকাশদা ধানাই পানাই পছন্দ করেন না। প্রথমেই এসে কাজের কথা তুলেছেন। বিয়ার কোম্পানির কাজটার খোঁজ উনিও পেয়ে গেছেন। অভিজিৎকে দিয়ে সেই কাজটা ন্যাশনালের জন্যে বাগাতে চান। এদের কাছে সব খবরই চট করে পৌঁছে যায়।

অভিজিৎ বলল, প্রকাশদা, আমি পাবলিসিটি লাইনটাই ছেড়ে দেব ভাবছি।

কেন?

এটা আমার আর পোষাচ্ছে না। এরমধ্যে এতরকম নোংরামি

কোথায় নোংরামি নেই?

ভাবছি নিজেই কোনো ছোটোখাটো ব্যবসা-ট্যাবসা

তোমার দ্বারা হবে না। ব্যবসা যারা করে, তারা আলাদা ধাতুর লোক। তুমি কক্ষনো পারবে না। ওসব বাজে কথা ছাড়। পাবলিসিটি লাইনে যারা একবার ঢোকে, তারা আর কখনো বেরুতে পারে না।

আমাকে বেরুতেই হবে। এ জীবন আর আমার সহ্য হচ্ছে না।

তুমি আর অন্য কিছু পারবে না।

আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি।

বেশ করছ। এখন ওঠো, জামাটা পরে নাও।

কেন?

আমার সঙ্গে বেরুবে। বড্ড গরম পড়েছে, চলো কোথাও বসে বিয়ার খেতে খেতে কথা হবে।

প্রকাশদা, আজ আর বেরুব না ভাবছি।

বেশ তো, তাহলে এখানেই বিয়ার আনাও। তোমার বউ আপত্তি করবে নাকি?

প্রকাশদা, আমি সত্যি মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছি।

বুঝেছি। মাঝে মাঝে এরকম মিডল-ক্লাস মরালিটি খোঁচা মারে। মিডল-ক্লাসের তো আর কিছুই নেই-শুধু কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ এই নিয়ে মাথা ঘামায়-এটা এক ধরনের বিলাসিতা। পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই বড়ো কথা-যে যত ভালোভাবে আর আরামে বাঁচতে পারে, সে সেই চেষ্টাই করে। এটাই নিয়ম। তবে কিছু লোক থাকে, যারা নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথাই শুধু ভাবে না।

আলবাত আছে, সেরকম লোক। যেমন সাধুসন্ন্যাসী। তুমি সন্ন্যাসী হতে পারবে! শুধু মদ ছাড়লে কী হবে, তুমি খাও দামি সিগারেট, খুব আধুনিক ধরনের জামাকাপড় ছাড়া তোমার চলে না, ভিড়ের ট্রামে-বাসে তুমি কক্ষনো চড়ো না, গাড়ি কেনোনি কিন্তু কথায় কথায় ট্যাক্সি -এসব তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে। এইসব কিছু তুমি একসঙ্গে ছাড়তে পারবে? চেষ্টা করে দেখো, কত শক্ত। আর যদি সত্যিই পারো, আমি তোমাকে মহাপুরুষ বলে মানব।

চেষ্টা করতে অন্তত দোষ কী।

ফলাফলের কথা ভেবে, তবেই মানুষ চেষ্টা করে। শোনো, আমি জানি, তোমার এইসব মহৎ চিন্তা বড়োজোর এক-দিন-দু-দিন থাকবে। খুব বেশি হ্যাংগ-ওভার হলে এরকম হয়। নিশ্চয়ই দু-একদিনের মধ্যে খুব বেশি মাতলামি করেছ বাড়ি ফিরে! এ-হচ্ছে তারই অনুশোচনা। দু-একদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে-আবার সব আগের মতন। তুমি দু একদিনের সময় নাও, তারপর আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? রতনলাল চাড্ডার কাজটা বাগানো দরকার।

না।

অভিজিৎ এমন তীব্রভাবে না বলল যে, প্রকাশ রায়চৌধুরী একটু চমকে উঠল। একটুক্ষণ অভিজিতের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করল।

তারপর বলল, না মানে?

ও কাজ আপনারা পাবেন না।

আপনারা মানেই বা কী? তুমি তো ন্যাশনালে আসছ, তাহলে ওটা তো আমাদের কাজ।

আমি ন্যাশনালে যাচ্ছি কে বলল? আমি তো কথা দিইনি!

না আসার কী আছে? এখানে তুমি টাকাটা অনেক বেশি পাচ্ছ।

প্রকাশদা টাকাটাই কি সব?

দু-দিন মদ খাওনি বলে কি, বোকা হয়ে গেলে? টাকার জন্যেই তো চাকরি-নইলে চাকরি করতে কার ভালো লাগে? সেইজন্যেই যেখানে বেশি টাকা পাওয়া যায় লোকে সেখানে চাকরি নেয়। অভিজিৎ, এটা তুমি বড্ড গোঁয়ারের মতন কথা বলছ।

সবাই জানে, আমি গোঁয়ার।

প্রকাশ রায়চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বেশ। তোমার মন আবার পালটালে আমাকে খবর দিয়ো। আজ তুমি হাই স্ট্রাং হয়ে আছ, দেখতেই পাচ্ছি।

দরজার দিকে এক পা বাড়িয়েও প্রকাশ রায়চৌধুরী আবার বসে পড়ে বলল, কফি! তোমার বউয়ের কাছে কফি খেতে চেয়েছি।

কিছুক্ষণ দু-জনেই চুপচাপ রায়চৌধুরী পা দোলাতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ থাকা তার স্বভাব নয়। একটু বাদেই আবার বলল, তুমি তাহলে ওই অফিসেই থাকছ? তোমাদের রাউরকেল্লার কাজটা নাকি মার খেয়েছে?

অভিজিৎ রুক্ষ গলায় বলল, প্রকাশদা, আজ রবিবার। ছুটির দিনে বাড়িতে বসে আমি অফিসের কথা আলোচনা করতে ভালোবাসি না।

প্রকাশ রায়চৌধুরী এবার সত্যিই অপমানিত বোধ করল। পাবলিসিটি মহলে সে একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক। তার সঙ্গে কেউ এরকমভাবে কথা বলে না।

সুমিত্রার হাত থেকে কফির কাপটা নিয়ে নিঃশব্দে পান করে বেরিয়ে গেল।

সুমিত্রা বলল, উনি রেগে চলে গেলেন মনে হচ্ছে? তুমি কিছু বলেছ।

অভিজিৎ হাসতে লাগল। অনেকটা পাগলের মতো হাসি। আজকাল মাঝে মাঝে এরকমভাবে একা একা হাসে। হাসতে হাসতেই বলল, ন্যাশনালেও আর চাকরি হবে না। সে-সুযোগটাও আমি ইচ্ছে করে নষ্ট করলাম।

কেন?

সে তুমি বুঝবে না। সে তোমাকে বোঝানো যাবে না।

সারাদিন অভিজিৎ বাড়ি থেকে বেরোল না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সস্তা ইংরেজি রহস্য কাহিনি পড়ল। সন্ধ্যের দিকে সুমিত্রাকে নিয়ে সিনেমায় গেল। তারপর বাইরের দোকানে চীনে খাবার খেল। এমন দোকানে ঢুকল, যেখানে মদ নেই। বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। সুমিত্রা ঘুমিয়ে পড়ার পরও অনেকক্ষণ তার ঘুম এল না। মাথার মধ্যে সব-সময়েই সেই এক চিন্তা। রতনলালের কাছ থেকে কাজটা আদায় করতেই হবে। ন্যাশনাল যেন কিছুতেই না পায়। এটা একটা চ্যালেঞ্জ অথচ কাজটা আদায় করতে তার গায়ে কতখানি ময়লা লাগবে?

পরদিন অফিসে যাওয়ার সময় সে শেলি দত্তকে আবার দেখতে পেল। মেয়ের হাত ধরে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে। আজ মনে হয়, মা আর মেয়ে দু-জনেই একসঙ্গে বাসে উঠবে।

শেয়ারে ট্যাক্সি ছিল না বলে অভিজিৎ সেদিন আলাদা একটা ট্যাক্সি নিয়েছে। ওদের কাছে এসে সে ট্যাক্সিটা থামাতে বলে শেলি দত্তকে ডাকল, আসুন, চটপট উঠে পড়ুন।

শেলি দত্ত চমকে গেল, কিন্তু দ্বিধা করল না। মেয়েকে নিয়ে উঠে পড়ল। অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, আপনার মেয়ের ইস্কুল কোথায়?

এই তো, এলগিন রোডে।

অভিজিৎ মেয়েটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, কোন ক্লাসে পড়ো?

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। চট করে উত্তর দিল, ক্লাস থ্রি।

বা:! বেশ উঁচু ক্লাসে পড়ো তো! তোমার নাম কী?

অসীমা মজুমদার।

অভিজিৎ মুচকি হাসল। শেলি দত্তের মেয়ের নাম অসীমা মজুমদার। বেশ! সে আগেই বুঝেছিল যে, শেলি দত্ত নামটা ছদ্মনাম। শেলি দত্তও অভিজিতের হাসির কারণটা বুঝতে পেরেছে সে মুখ ফিরিয়ে রইল অন্যদিকে।

এলগিন রোড না আসা পর্যন্ত অভিজিৎ আর কোনো কথা বলল না। মেয়েটি স্কুলে নেমে যাওয়ার পর শেলি দত্তকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন দিকে যাবেন?

আমাকে একটু ধর্মতলায় নামিয়ে দিয়ে যেতে পারবেন?

পারব! আপনার আসল নাম কী?

নাই বা জানলেন।

বাড়িতে আর কে আছে?

আমার আর একটি ছেলে আছে, মা আছেন, একটি ছোটোবোন।

আপনার স্বামী?

উনি পাগল।

শেলি দত্তের শরীরে যৌবন আছে, মুখখানি সুশ্রী, তার এরকম দুর্ভাগ্য প্রাপ্য ছিল না। বাড়িতে রোজগারের কেউ নেই বোঝা যাচ্ছে। পাগল স্বামীকে নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট, এর চেয়ে লোকটি মরে গেলেও বোধ হয় ভালো ছিল।

অভিজিতের মুখ দিয়ে আর একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছিল, আপনি চাকরি করতে পারেন না? কিন্তু সেটা বলল না। এর উত্তরেই যদি মেয়েটি বলত, আপনি একটা চাকরি দেবেন? তাহলে সে কী উত্তর দিত?

শেলি দত্তের মুখে একটা দুঃখ ও অপরাধবোধ আছে। বোঝা যায়। সে একটা সাধারণ সুস্থ জীবনই চেয়েছিল। রতনলাল চাড্ডার চাপড় মারার জন্যে সে নিজের ঊরু ব্যবহার করতে দিতে সহজে রাজি হয়নি নিশ্চয়ই। অনেক অন্ধকার পথ তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এ মেয়েটি ঠিক কেতকীর মতন নয়। কেতকী যেরকম জীবন পেয়েছে তাতেই সে বেশ খুশি। কিন্তু শেলি দত্ত খুশি নয়। এখনও হয়তো সে সুযোগ পেলে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু কে তাকে সেই সুযোগ দেবে?

অভিজিতের মনে পড়ল প্রকাশদার কথাটা। এসব মিডল-ক্লাস সেন্টিমেন্ট। মিডল ক্লাসই ভালো আর মন্দ নিয়ে বড়ো বেশি চিন্তা করে। পাগল স্বামী আর ছেলে-মেয়ে সংসার নিয়ে শেলি দত্ত ঘোর বিপদের মধ্যে পড়েছে। সে যদি সতী থাকার জন্য ছেলে-মেয়েকে না খাইয়ে রাখত-সেটা ভালো হত? তার যখন কোনো উপায় নেই, তখন মাঝে মাঝে ঊরু ভাড়া দেওয়া এমন আর দোষের কী? সতীত্ব জিনিসটাই তো মাত্র কয়েকশো বছরের তৈরি একটা সংস্কার। তাও পৃথিবীর অনেক দেশেই সেটা এখন উঠে যাচ্ছে আবার।

শেলি দত্তের ওপর কোনো রাগ হয় না অভিজিতের। সেদিন কেতকীর ওপরেই বা সে অত রেগে গিয়েছিল কেন? বার বার তাকে খুন করার কথা বলছিল, কোনো মানে হয় না!

তবে, রাগ হয় রতনলালের মতন মানুষদের ওপর। টাকা আছে বলেই সে, একটা মেয়ের ঊরু চাপড়াবার অধিকার পাবে?

হঠাৎ অভিজিতের একটা কথা মনে পড়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, রতনলাল কবে কলকাতায় ফিরবে বলতে পারেন?

তিন তারিখ, তার মানে পরশু।

রাত্তিরে?

না, সকালের প্লেনে।

রাত্তিরে ওর ফ্ল্যাটে আপনার যাওয়ার কথা আছে?

হ্যাঁ।

আপনি কি ওর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করেন?

না, উনি কলকাতায় থাকলে আমি রোজই যাই।

অভিজিৎ চুপ করে গেল। তবু শেলি দত্ত নিজের থেকেই বলল, তবে আর বেশিদিন বোধ হয় আমাকে যেতে হবে না।

কেন?

আমার যে ছেলেমেয়ে আছে, উনি বোধ হয় জেনে ফেলেছেন। উনি কুমারী মেয়ে ছাড়া পছন্দ করেন না। আর, একটি মেয়েও খুব ঘোরাঘুরি করছে।

অভিজিৎ হেসে উঠল, তার সেই পাগলাটে ধরনের হাসি। শেলি দত্তের মুখের ওপর স্থিরদৃষ্টি রেখে সে হাসতে থাকে। তারপর হাসি থামিয়ে সে বলল, আর একটি মেয়ে বুঝি

আপনার কাছ থেকে আপনার মক্কেল কেড়ে নিতে চাইছে? আপনাদের লাইনেও খুব কম্পিটিশান আছে!

শেলি দত্ত লজ্জা পেল না। বরং তিক্ত গলায় বলল, তা তো হবেই, আমার মতন অভাবী মেয়েও তো কম নেই এদেশে।

অভিজিৎ একথাটা মন দিয়ে শুনল না। সে অন্য কথা ভাবছে। প্রকাশদাও তো কাল এসেছিল রতনলালকে হাত করার জন্যে। প্রকাশদাও চাইছে অভিজিতের কোম্পানির বদলে ন্যাশনালের জন্যে রতনলালকে কেড়ে নিতে। অন্য দুটি বেশ্যার চেয়ে তার আর প্রকাশদার তফাত কী? ব্যাপারটা তো একই।

অভিজিৎ মনে মনে হাসতে লাগল।

ধর্মতলায় শেলি দত্তকে নামাতে গিয়ে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, আপনার কি খুব তাড়া আছে? চলুন না, কোথাও বসে একটু চা খাই।

শেলি দত্ত একটু চিন্তা করে বলল, বেশ, চলুন।

অভিজিৎ সঙ্গে সঙ্গে বলল, না থাক। আজ নয়, অন্য একদিন।

শেলি দত্তের সঙ্গে চা খাবার একটুও ইচ্ছে তার নেই। সে শুধু দেখতে চাইছিল মেয়েটি রাজি হয় কি না।

শেলি দত্ত ট্যাক্সি থেকে নেমে, অভিজিৎকে শুকনো ধন্যবাদ দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। তার ভুরু থেকে এখনও বিস্ময়ের চিহ্ন মেলায়নি।

অভিজিৎ একবার চা খাওয়ার কথা বলেও আবার মন বদলে ফেলল কেন, সে সেটা বুঝতে পারেনি। সে ধরেই নিয়েছিল, অভিজিৎ যখন তাকে ট্যাক্সিতে লিফট দিয়েছে, তখন তার বদলে কিছু চাইবে।

কোনো রেস্টুরেন্টের কেবিনে বসে অন্তত কিছুক্ষণ জড়াজড়ি–পুরুষমানুষের কাছ থেকে সে এইরকম কিছু আসা করে।

যতক্ষণ দেখা যায়, অভিজিৎ জানলা দিয়ে শেলি দত্তের দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি এ সময় এ পাড়ায় কোথায় গেল? সে কি কোনো চাকরি করে? মনে তো হয় না। চাকুরে মেয়েদের হাঁটার ভঙ্গি আলাদা হয়। শেলি দত্ত হাঁটছে খুব অলসভাবে যেন আর কোনো তাড়া নেই। সে কি দিনের বেলাতেও আরও কোথাও কোথাও তার ঊরু ভাড়া দেয়?

অভিজিতের আবার মনে হল, এই মেয়েটির একটা সুস্থ সুন্দর জীবন প্রাপ্য ছিল। ও কেন রতনলালের কাছে যাবে? একদিন ওর মেয়ে বড় হয়ে যদি এসব কথা জানতে পারে? ওকে এখনও ফেরানো যায় না?

অভিজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এসব মৌখিক চিন্তা! শেলি দত্তকে সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। সে কি অসীমদের চাকরি বাঁচাতে পারবে?

অফিসে এসে অভিজিৎ কাজে মন বসাবার চেষ্টা করল! মিস্টার রক্ষিত দিল্লি গেছেন, দিন দশেক বাদে ফিরবেন। তারপরেই অফিসে অনেক ওলটপালট হবে! অফিসে তার ঘর আলাদা। উলটো দিকের বড়া হলঘরটার বেশিরভাগ কর্মী বসে। তারই এক পাশে আর্ট ডিপার্টমেন্ট। অসীমের খালি চেয়ারটার ওপর বারবার চোখ পড়ে অভিজিতের। এ ছাড়া, রঞ্জন, নিশীথ আর সুকুমার। ক-দিন ধরে একটু বেশিই যেন দেখা হচ্ছে ওদের সঙ্গে। কাজের জন্য ওরা ঘন ঘন আসছে অভিজিতের ঘরে। ওরা কি কিছু সন্দেহ করে?

সুকুমার তার ঘরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, স্যার, আপনি কি এখন খুব ব্যস্ত আছেন?

অভিজিৎ ভয় পেয়ে গেল। কী বলতে এসেছে সুকুমার?

শুকনো ভাবে সে বললে, না তেমন ব্যস্ত নয়, কী ব্যাপার?

সুকুমার ভেতরে ঢুকে বলল, আপনি শুনেছেন বোধ হয়, আমরা বই ঠিক করে ফেলেছি।

অভিজিৎ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, কিছুই মানে বুঝতে পারল না। বই ঠিক করেছি মানে? তারপর তার মনে পড়ল, থিয়েটার। স্টাফেরা প্রতি বছরই একটা থিয়েটার করে। সেই সম্পর্কে কিছু বলতে এসেছে।

অভিজিৎ একটু বিরক্ত হল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আছে, আরও তো অফিসার আছে, তবু সব ব্যাপারেই এরা তাকে বলতে আসে কেন?

সুকুমার বলল, আমরা হল ভাড়া করেছি, আর মাত্র চোদ্দো দিন সময়, তাই অন্তত দু ঘণ্টা রিহার্সাল না দিলে

বেশ তো!

কাজ তো এখন বেশি নেই, তাই চারটে থেকে যদি রিহার্সাল শুরু করি

অভিজিৎ এবার কঠোরভাবে বলল, না। পাঁচটার আগে নয়।

তাতে বড্ড দেরি হয়ে যায়। দু-একজনকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে হয়।

তা হোক। পাঁচটার আগে ওসব কিছু চলবে না। অফিসের একটা ডিসিপ্লিন আছে তো। বাইরে থেকে হঠাৎ একজন লোক এলে ভাববে কী? অফিসের মধ্যে নাটক হচ্ছে!

সুকুমার কাঁচুমাচু মুখে তবু দাঁড়িয়ে রইল। অভিজিৎ তাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলল, সামনের সপ্তাহে তো দুটো ছুটির দিন আছে, তখন বেশি সময় পাবে।

সুকুমার চলে গেল। সে একটু আদুরে ধরনের ছেলে, প্রায়ই নানারকম আবদার করতে আসে। নাটকের ব্যাপারে ওরই বেশি উৎসাহ। কয়েকদিন বেশ হইচই হয়। এ-অফিসে কোনো মেয়ে-কর্মী নেই, তাই অভিনেত্রী ভাড়া করে আনতে হয় বাইরে থেকে তাদের সঙ্গে খানিকটা ফষ্টিনষ্টি...

সুকুমার জানে না তার মাথার ওপর কীরকম খাঁড়া ঝুলে আছে। নাটক নিয়ে মত্ত, অথচ ক-দিন বাদেই চাকরি যাবে, সুকুমার কাজ খুব ভালো শেখেনি, অন্য কোথাও চাকরি পাওয়া তার পক্ষে বেশ শক্ত হবে।

কী একটা উপলক্ষ্যে যেন সুকুমারদের বাড়িতে একবার নেমন্তন্ন খেতে যেতে হয়েছিল অভিজিৎকে। সুকুমারের বাড়ি ব্যারাকপুর, ট্রেনে যাতায়াত করে। সুকুমারের একগাদা ভাই বোন, ওর বাবা একটা সামান্য চাকরি করে। সুকুমার প্রায় সাড়ে সাত-শো টাকার মতন পায়, হঠাৎ সেই আয় বন্ধ হয়ে গেলে কী করে চলবে ওদের সংসার?

একসময় নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল অভিজিৎ। অন্যের সংসার কী করে চলবে, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা কেন? সে ওরা বুঝবে, আরও তো কত লোকের চাকরি যায়, সেজন্যে অভিজিৎ কি দায়ী!

তিন-চারদিন ধরে মদ খাচ্ছে না বলেই বোধ হয় অভিজিতের মাথায় এইসব চিন্তা আসছে। রাত্তিরে খুব বেশি মদ্যপান করলে পরদিন সকালে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথা টলটলে হয়ে থাকে। সেই অবস্থাটা কাটতে না কাটতেই আবার মদ খাওয়ার সময় চলে আসে, তখন আর অন্যের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় থাকে না। এখন অভিজিতের মাথাটা পরিষ্কার, তাই ঘুরেফিরে মাথায় নানারকম চিন্তা আসছে।

অনেক চেষ্টা করেও অভিজিৎ তার মাথা থেকে ওই চার জনের কথা তাড়াতে পারল না। মিস্টার রক্ষিত দিল্লি থেকে ফিরলেই অভিজিৎকে ব্যবস্থা নিতে হবে। এদেশে আরও চার জন বেকারের সংখ্যা বাড়বে। অভিজিতের কিছু করার নেই। অভিজিৎ তো আর ওদের ভাগ্য বদলাতে পারে না।

কিংবা পারে। জীবনে এই প্রথম অভিজিৎ এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়েছে, যেখানে অনেকটা তার ওপরেই চার জন পুরুষমানুষের ভালো-মন্দ নির্ভর করছে। সে রতনলালের কাজটা জোগাড় করতে পারলে ওদের চাকরি বাঁচবে। তার জন্যে রতনলালকে তোষামোদ

করতে হবে। অভিজিৎকে অনেকটা নীচে নামতে হবে। ছেলে-মেয়ের মুখ চেয়ে শেলি দত্তকে যেমন অসতী হতে হয়েছে। শেলি দত্ত যদি পারে, অভিজিৎ-ই বা কেন পারবে না?

পার্ক সার্কাসের একটা বারে ঢুকে অভিজিৎ ঠিক তিন পেগ হুইস্কি খেল। এর বেশি আর খাবে না, সে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল। এইটুকু দরকার তার শরীরটাকে চাঙ্গা করার জন্যে। সাহস আনার জন্যেও বটে।

তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সে চলে এল কেতকীর ফ্ল্যাটে। বেল বাজাবার পর দরজা খুলে দিল একটি বাচ্চা চাকর। ভেতরে বসবার ঘরে সোফার ওপরে আধশোওয়া অবস্থায় রয়েছে নিখিল, গেঞ্জি আর পাজামা পরা। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে কিছু কাগজপত্র দেখছে।

অভিজিৎকে দেখে সে খুব একটা উৎসাহ দেখাল না। শুকনোভাবে বলল, কী রে, অভিজিৎ? খবর ভালো? কেতকী তো নেই। যেন অভিজিৎ কেতকীকেই খুঁজতে এসেছে। নিখিল একথা ভাবল কী করে? সে একা কেতকীর সঙ্গে দেখা করতে আসবে?

তবু ওর কথার উত্তরে বলল, কেন, কোথায় গেছে?

নিখিল বলল, কী যেন ওর মাসি না ফাসি কার বাড়িতে গেল! বলেছিল তো সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরবে! তুই বোস, ও ফিরল বোধ হয়।

তুই বম্বেতে কবে ফিরবি?

ঠিক নেই।

ছুটি নিয়েছিস অফিস থেকে?

অফিস! ওঃ হ্যাঁ, লম্বা ছুটি নিয়ে রেখেছি-বোধ হয় অফিসটা ছেড়েই দেব।

তোকে এবার যে-কাজে ব্যস্ত দেখছি, তার সঙ্গে তোর আগেকার অফিসের কাজের কোনো সম্পর্ক নেই।

তা ঠিক। তুই তাহলে বোস, আমি এই জরুরি কাগজগুলো একটু দেখে নিই।

নিখিল, আমি তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আমার সঙ্গে? কী কথা বল!

তুই আমার ওপর চটে আছিস মনে হচ্ছে? সেদিন একটু বেশি মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম

সে কিছু নয়। তুই কিছু বলবি আমাকে?

আমার জানতে ইচ্ছে করছে, সে-দিন সেই যে রাস্তায় তোদের সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা হল, সে-দিন প্রায় জোর করেই তুই আমাকে রতনলালের ফ্ল্যাটে হঠাৎ নিয়ে গেলি কেন?

তোকে দেখে আমার একটা কথা মনে পড়েছিল। আমরা একটা বড়ো প্রোজেক্টে হাত দিয়েছি। এর থেকে তোকে কিছু কাজ পাইয়ে দেওয়া যায়। আমাদের তো পাবলিসিটি করতেই হবে। পুরোনো বন্ধুকে কি মানুষ সাহায্য করে না?

কিন্তু নিখিল, আমরা যখন কলেজে পড়তাম, তখন ছিলাম খানিকটা আদর্শবাদী ধরনের, সৎ মানুষ। এখন আস্তে আস্তে আমরা কোথায় চলে যাচ্ছি? টাকাপয়সা রোজগারের জন্যে আমরা বোধ হয় এখন নরকেও নামতে রাজি।

তুই টাকাপয়সা চাস না?

চাই, কিন্তু

সন্ধে বেলা তুই কি আমাকে রামকৃষ্ণদেবের বাণী শোনাতে এসেছিস? কাজের কথা বল!

কাজের কথাই বলতে এসেছি। তোদের ওই কাজটা আমার চাই।

তবে ওদের আদর্শ-ফাদর্শের কথা বলছিলি কেন? টাকাপয়সা নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে, তারা সবাই এক-একটা বাস্তুঘুঘু। অনেক চেষ্টা করে ওদের কাছ থেকে ছিটেফোঁটা আদায় করা যায়। আদর্শ-ফাদর্শর কথা তুললেই ওরা তোর ঘাড় মটকাবে। ইফ ইউ কানট বিট দেম, জয়েন দেম! এই হচ্ছে আমার মোটো। তুই কী চাস, আগে মত ঠিক কর।

নিখিল, তুই আগে অন্যরকম ছিলি। এখন অনেক বদলে গেছিস!

তার মানে, খারাপ হয়ে গেছি?

তুই এখন যেসব লোকের সঙ্গে মিশিস-যারা তোর বন্ধু, তারা তো সব ভয়ংকর লোক।

আমার তো ভয়ংকর মনে হয় না। তা ছাড়া সবাই বদলায়। তুই বদলাসনি? যে-অভিজিৎ এককালে ছিল কত শান্তশিষ্ট, সে যে এ-রকম মাতাল হবে, কে ভেবেছিল? যাই হোক, তুই তাহলে ওই কাজটা করতে পারবি না?

আমি ওই কাজটা চাই। আমাকে পেতেই হবে!

কিন্তু দুর্বল লোক হলে আমাদের কোনো কাজ হবে না। তুই মাঝে মাঝে এত উলটোপালটা কথা বলিস কেন? ওখান থেকে দুটো গেলাস নিয়ে আয়।

আমি মদ খাব না।

খানিকটা তো খেয়ে এসেছিস দেখছি, গন্ধ পাচ্ছি।

সে সামান্য একটু।

ভয় পাবার কিছু নেই। যতটা ইচ্ছে হয় খাবি। কিন্তু এত আউট হয়ে যাস কেন? তখন বড্ড আজেবাজে কথা বলিস!

সেইজন্যেই তো কম খাব। তুই যা বলবি তাই শুনব।

নিখিল নিজেই উঠে গিয়ে গেলাস নিয়ে এল। দু-টি গেলাসে হুইস্কি ঢালল। তারপর বলল, তোর মুখটা এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন রে অভিজিৎ? কী হয়েছে, শরীর খারাপ?

না তো!

তবু কীরকম যেন দেখাচ্ছে।

অভিজিতের ঠোঁটে ও চোখে অভিমান জমে উঠল। নিখিল তার পুরোনো বন্ধু। কিন্তু আজ নিখিল তার সঙ্গে কথা বলছে হুকুমের সুরে। কোনো বন্ধুবান্ধবই আগে এভাবে অভিজিতের সঙ্গে কথা বলার সাহস করেনি। তবু অভিজিৎকে সব মেনে নিতেই হবে, কারণ সে কাজের উমেদার হয়ে এসেছে।

মদের গেলাস সে স্পর্শও করল না। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, রতনলাল আজ কলকাতায় ফিরবে শুনেছি–আজ তার সঙ্গে দেখা করা যায়?

কার কাছ থেকে শুনেছিস?

সে-দিন যে-মেয়েটিকে ওখানে দেখেছিলাম, তার সঙ্গে আজ সকালে রাস্তায় দেখা হল, সে-ই বলল

রতনলালের মেয়েদের সঙ্গে তুই কি আলাদা করে বাইরে দেখা করছিস নাকি?

না না, এমনি হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

ওদের কোনো কথায় বিশ্বাস করবি না।

রতনলাল তাহলে আজ ফিরছে না?

হ্যাঁ, আজ ফিরবে। কিন্তু আজ আর আমি ওখানে যাব না। কাল-পরশু গেলেই হবে। আমি মুম্বাই থেকে একটা টেলিগ্রামের জন্যে অপেক্ষা করছি।

বাবুভাই লোকটা কে রে নিখিল?

একজন বড়ো ব্যবসায়ী। এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের ব্যবসা।

একইসঙ্গে এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট?

হ্যাঁ, সহজ ভাষায় যাকে বলে স্মাগলিং।

আর রতনলাল তার শাকরেদ?

হ্যাঁ। কেন, তুই ভয় পাচ্ছিস?

বিবর্ণ মুখখানাতে জোর করে হাসি ফুটিয়ে অভিজিৎ বলল, না না। ভয় পাব কেন? আমার হচ্ছে কাজ নিয়ে কথা। আচ্ছা নিখিল, ওই কাজটার ব্যাপার আজ পাকা করে ফেলা যায় না। নইলে আমাদের অফিসে মহাগোলমাল হয়ে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি, যা কমিশন পাব, তোকে তার অর্ধেক দিয়ে দেব।

নিখিল হাসতে হাসতে বলল, তুই কি আমাকেও ঘুস দিতে চাইছিস নাকি? আমি নিজেই তো তোকে কাজটা দেওয়ার জন্যে নিয়ে গেলাম। আমি নিজের স্বার্থের কথা ভাবিনি, তোর উপকারই করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এত তাড়াহুড়োর কী আছে?

এক্ষুনি একাজটা না পেলে আমাদের অফিসে ছাঁটাই শুরু হয়ে যাবে।

তোর চাকরির ভাবনা কী? তুই ঠিক কাজ পেয়ে যাবি।

আমার জন্যে নয়।

শোন, ফ্যাক্টরিটা আমরা স্টার্ট করে ফেলছি সামনের মাসেই কিন্তু প্রোডাকশন শুরু করে বাজারে মাল ছাড়তে অন্তত একবছর লেগে বাবে। তখন দরকার হবে পাবলিসিটির। মাসে আড়াই লাখ টাকা বাজেট ধরেছি, আর একটু বাড়তে পারে, কিন্তু এক্ষুনি তাড়াহুড়ো করার তো কিছু নেই।

এবার অভিজিতের বুকের মধ্যে একটা ঘা লাগল! এক বছর! কাজ শুরু হবে এক বছর পরে! তাহলে আর অসীমদের চার জনকে বাঁচানো গেল না! আর চেষ্টা করেও লাভ নেই।

প্রায় শুকনো গলায় সে বলল, এতদিন দেরি হবে?

ইতিমধ্যে প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরি হতে থাকুক। একটা বড়ো কাজ, হুট করে তো শুরু করা যায় না।

অভিজিৎ মনে মনে ভাবল, দুর ছাই! এতদিন পর একাজ পেয়ে তার লাভটা কী? সব। আশা শেষ হয়ে গেল।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অভিজিৎ আবার মন বদলাল। এই কাজটা জোগাড় করা চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ন্যাশনাল যাতে না পায়। কাজটা এলে, পরে আবার অসীমদের ডেকে চাকরি দেওয়া যেতে পারে। সে বলল, তবু আমার কোম্পানিই যে কাজটা পাবে, তার একটা পাকা কথা হওয়ার দরকার। বাজারে আরও অনেক কুমারী মেয়ে আছে।

কুমারী মেয়ে? তার মানে? কী বলছিস তুই?

ও, ভুল করে বলে ফেলেছি। আসলে বলছিলাম, বাজারে আরও কোম্পানি আছে।

নিখিল হো হো করে হেসে উঠল। এতক্ষণ বাদে সে আন্তরিকভাবে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, তোর কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? নে, খাচ্ছিস না কেন?

আমি খাব না।

তুই এত কী ভাসছিস বল তো! এত চিন্তার কী আছে?

কিছুই ভালো লাগছে না আমার। এই কাজটার ওপর আমি অনেকখানি ভরসা করেছিলাম। এমন একটা সমস্যায় পড়েছি, তোকে ঠিক বলে বোঝানো যাবে না-সেইজন্য আমি অনেক নীচেও নামতে রাজি ছিলাম রতনলালকে তোষামোদ করেও যদি

নিজের গেলাস শেষ করে নিখিল উঠে দাঁড়াল। বলল, চল, রতনলালের কাছেই যাই। তুই যখন এত ছটফট করছিস।

রতনলালের ফ্ল্যাটে শেলি দত্ত এরমধ্যেই এসে গেছে। বাদল আর একজন অচেনা লোক রয়েছে। অচেনা লোকটির নাম ধনরাজ সরোগি। ওরা সবাই মিলে তাস খেলছিল। রতনলাল ওদের দেখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আরে আসুন আসুন। কী খবর? সব ভালো তো?

অভিজিৎকে বলল, সেদিন আপনি চলে গেলেন, কোনো কথাই তো হল না।

অভিজিৎ বিনীতভাবে বলল, সেইজন্যেই আজ এলাম।

ধনরাজ হাতের তাস ফেলে দিয়ে বলল, লিন, এবার আপনোক খেলুন, আমি তাস খেলা জানি না, তবু রতনলাল আমাকে জোর করে খেলাবে।

রতনলাল বলল, নিখিলবাবু এসে গেছে, এবার অন্য খেলা হবে। আসুন আগে কাজের কথাটা সেরে নিই।

নিখিল রতনলালের সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেল। নিশ্চয়ই ওদের কোনো গোপন কথা আছে।

আজ বসবার ঘরের একপাশেও স্তূপ করা জামাকাপড়ের প্যাকেট। অভিজিৎ সেদিকে একবার কৌতূহলী চোখে তাকাল। এগুলির মধ্যে কী রহস্য আছে কে জানে? বাদলকে সে বলল, আমি কেতকীর ওখানে গিয়েছিলাম।

বাদল সে ব্যাপারে কোনো কৌতূহল দেখাল না। কেতকী একা ছিল কি না, অভিজিৎ সেখানে কতক্ষণ কাটিয়েছে, সে-সম্পর্কে ওর কোনো ঔৎসুক্যই নেই! ও শুধু বলল, কেতকীকে সঙ্গে নিয়ে এলেই পারতিস! ও এল না?

না, ও নেই। মাসির বাড়ি গেছে!

ওর আবার মাসি এল কোথা থেকে? যতসব।

শেলি দত্ত মন দিয়ে ওদের কথা শুনছে। অভিজিতের চোখে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিল।

শেলি দত্তর এখন অন্যরকম চেহারা। ঝলমলে শাড়ি পরেছে, ঠোঁটে লিপস্টিক, মাথায় মস্ত বড়ো খোঁপা। কিন্তু সে যে কুমারী মেয়ে নয়, তার দুটি সন্তান আছে, একথা জেনে গেছে রতনলাল।

নিখিল আর রতনলাল ফিরে এল। সোফার বদলে মেঝের কার্পেটে বসে পড়ে রতনলাল বলল, আসুন, তাস খেলা যাক। তারপর শেলি দত্তর দিকে ফিরে ধমক দিয়ে বলল, বাবুজিকে এখনও হুইস্কি দাওনি? নিয়ে এসো গ্লাস।

অভিজিৎ বলল, থাক দরকার নেই। আমি খাব না।

আরে খান খান। ভালো স্কচ আছে!

যেন অভিজিৎ জীবনে স্কচ খায়নি, তাই তাকে লোভ দেখানো হচ্ছে। সে একটু দৃঢ় গলায় বলল, না, আজ খাব না।

আমরা খাচ্ছি আপনি খাবেন না? আপনি বুঝি বেশিদিন বাঁচতে চান?

অভিজিৎ দেখল নিখিল তার দিকে চোখ টিপে ইশারা করছে। তখন তার মনে পড়ল। বাদল বলেছিল, রতনলালকে সবসময় তোষামোদ করতে হবে। তার মুখের ওপর কিছুতেই না বলা যাবে না।

অভিজিৎ তক্ষুনি গলার স্বর পালটে, মধুরভাবে বলল, ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন, তখন কি না খেয়ে পারি, তা ছাড়া এত ভালো স্কচ

টেস্ট করে দেখুন। এত ভালো জিনিস সহজে পাওয়া যায় না।

অভিজিৎ বলল, সে তো বটেই, এত ভালো জিনিস কি সহজে পাওয়া যায়?

আপনি থ্রি কার্ডস জানেন?

থ্রি কার্ডস মানে তিন তাস। হোস্টেলে থাকার সময় অভিজিৎ এই খেলা শিখেছিল। খেলাটা সে ভালোই জানে। কিন্তু এখন তাস খেলতে বসলে কাজের কথা হবে কখন? তবে রতনলাল যখন তাস খেলার কথা বলছে তখন খেলতেই হবে। বলল, হ্যাঁ, জানি।

তাহলে আসুন বসে যাই। আমরা চার জন। আসুন নিখিলজি।

তাস বিলি করা হল, এক টাকা করে পয়েন্ট। অভিজিতের কাছে শ-দেড়েক টাকা আছে, ওই দিয়েই চালাতে পারবে।

শেলি দত্ত তার ভরতি গেলাস রাখল। একটা চুমুক দিয়েই অভিজিৎ ভাবল, চেষ্টা করলে কী হবে, এইসব পরিবেশে সে মদ খাওয়া কমাতে পারবে না। ইফ ইউ কানট বিট দেম, জয়েন দেম–নিখিলের এই কথাটা ঠিক। বার বার সে সুমিত্রার কাছে কথা দিয়ে আসে, বার বার সে শপথ ভাঙতে হয়। রতনলালকে তোষামোদ না করলে, কাজটা জুটবে না। সুতরাং রতনলালের অনুরোধে তাকে মদ খেতেই হবে।

প্রথম পর পর চার বার অভিজিৎ হারল। রতনলাল বেশ চালু খেলোয়াড়।

সাবধানে খেলতে হবে ওর সঙ্গে। তার টাকা এরমধ্যেই ফুরিয়ে এসেছে। হঠাৎ সব ফুরিয়ে গেলে বোকা বনে যেতে হবে। পরের দু-বার জিতে গেল অভিজিৎ! কিন্তু বাদল আর নিখিল দু-জনেই বোকার মতন হারছে।

ধনরাজ চুপচাপ বসে আছে। তার ভালো লাগার কথা নয়। সে একসময় বলল, রতনলালজি, আমি তবে আজ উঠি। কাজকামের কথা পরে হবে?

রতনলাল তাকে নমস্কার জানিয়ে বলল, আচ্ছা ধনরাজজি, নমস্তে। আপ ঘর যাইয়ে। দয়া করে যে এখানে এসেছেন...আপকা মেহেরবানি! কাল আমি টেলিফোনে আপনার সঙ্গে বাতচিত করব, আচ্ছা...গুডনাইট।

ধনরাজ বেরিয়ে যেতেই রতনলাল বলল, শালা একনম্বর হারামি!

বাদল বলল, যা বলেছেন।

নিখিল বলল, মুখ দেখলেই বোঝা যায়!

অভিজিৎ অবাক হল না। সে ভাবল, ধনরাজ সম্পর্কে সে-ও একটা খারাপ কথা বলবে কিনা, ঠিক মতন মনে এল না।

পরের খেলায় অভিজিৎ একসঙ্গে জিতে গেল দু-শো টাকা। সে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। জুয়ায় জিতলেই গা গরম হয়ে যায়। রতনলালের দুর্বলতা সে ধরে ফেলেছে। আজ বেশ কিছু টাকা জিতে নিতে হবে

উৎসাহের চোটে সে একচুমুকে গেলাস শেষ করল। শেলি দত্ত পরের বার ভরতি গেলাস নিয়ে এসে অভিজিতের হাতে দেওয়ার সময় তার আঙুলটা টিপে দিল। কী যেন ইঙ্গিত

করছে। অভিজিৎ চমকে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। শেলি মাথা নেড়ে ইশারা করল। অভিজিৎ মানে বুঝতে পারল না।

অভিজিৎ রতনলালকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের ফ্যাক্টরির কাজ তো শুরু হয়ে যাচ্ছে–সে পাবলিসিটির ব্যাপারটা

হবে। আপনার সঙ্গে পরে কথা হবে–এই তো আমি মুম্বাই যাচ্ছি পরশু, ফিরব এক মাস বাদ, তখন আপনার সঙ্গে বসব একদিন। আপনি প্ল্যান-প্রোগ্রাম করুন।

একটা পাকাকথা হয়ে গেলে হত না?

এই তো পাকাকথা।

না মানে, একটা লিখিত কনট্রাক্ট, আমি কনট্রাক্ট টাইপ করিয়ে এনেছি–

কনট্রাক্ট? ঠিক আছে। কনট্রাক্ট হবে–এটা তো জুন মাস, ডিসেম্বরে হবে।

নিখিল অভিজিতের পিঠে একটা গুঁতো মারল। এইভাবে রতনলালের সঙ্গে কথা বলা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না! তবু অভিজিতকে একটা কিছু ঠিক করতেই হবে। সে আবার বলল, তবু যদি পড়ে দেখতেন, টার্মস ঠিক আছে কি না।

রতনলাল যেন খুবই অবাক হয়ে বলল, টার্মস? আপনি কাম করবেন, আমি টাকা দিব। এরমধ্যে আবার টার্মস কী?

অভিজিৎ বলল, তবু ধরুন, কাজের ভলিউম, ডিসপ্লে, লে আউট–আপনারা অ্যাপ্রুভ করবেন না, তারপর মোড অব পেমেন্ট

রতনলাল হাতে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বলল, পরে হবে ওসব কথা, নিন, খেলুন, ব্লাইণ্ড দেবেন না তাস উঠাবেন?

অভিজিৎ আরও দু-দান নিঃশব্দে খেলে গেল। তবু তার মনের মধ্যে খচ খচ করছে। শুধু মদ খেয়ে আর তাস খেলে সময় নষ্ট করলে কী চলবে? চারটে ছেলের মাথার ওপরে খাঁড়া ঝুলছে। আজই একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার।

সে আবার বলল, রতনলালজি, আমাদের কোম্পানির সঙ্গে আপনারা একটা কনট্রাক্ট যদি অন্তত করে রাখতেন

রতনলাল বলল, কাজের কথা আজ একদম ভালো লাগছে না। মুম্বাই থেকে ফিরে আসি। আপনি তারপর একদিন আসবেন–কাগজপত্র আপনার বন্ধুকে দেখান।

নিখিল বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি দেখে দেব। উনি তো বলছেনই মুম্বাই থেকে ফিরে এসে কথা বললেন। কাজটা তো একরকম ঠিকঠাক হয়ে গেল। মুখের কথাতেই এখানে সব কাজ চলে।

মুখের কথা! কিন্তু অভিজিতের অফিসের মালিক তো এই মুখের কথা বিশ্বাস করবে না। চার জন ছাঁটাই হবেই। অভিজিৎ অসহায় বোধ করল। তার কি আর কিছু করার আছে? এত চেষ্টা করেও কিছুই হল না।

হঠাৎ অভিজিতের মনে হল, এইসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে গেলে কেমন হয়? হঠাৎ তার চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটা খোলা মাঠ, সদ্য বৃষ্টি হয়ে গেছে। বড়ো বড়ো ঘাস, ঠিক সবুজ মখমলের মতন–নদী থেকে হু-হু করে ছুটে আসছে হাওয়া...। ছেলেবেলায় অভিজিৎ দেউলটি গ্রামে অনেকদিন ছিল, সেখানকার দৃশ্য। ওখানে যদি আবার ফিরে যাওয়া যেত। সুমিত্রা রাজি হবে না? প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সব টাকা তুলে...

কী রে, খেলছিস না?

হ্যাঁ হ্যাঁ খেলছি।

রাগে দাঁতে দাঁত চাপল অভিজিৎ। খেলায় এদের দেখিয়ে দিতে হবে। দেখবে সে আজ রতনলালের কত টাকার জোর আছে। বাদল আর নিখিলটা তো কিছু জানে না, তবু খেলছে কেন? শুধু শুধু হেরে মরছে?

পরের বার অভিজিৎ হারল। সব টাকা পেল রতনলাল। নিখিল বলল, রতনলালজি, ব্লাইণ্ডেই আপনার এত ভালো লাক।

বাদল বলল, ওনার টেকনিকই দারুণ। প্রত্যেকবারই নতুনরকম।

অভিজিৎ মনে মনে বলল, হু টেকনিক না ছাই! ভালো তাস পেলে কেউই হারে না। ওকে আমি এবার ব্লাইণ্ড খেলার টেকনিক শেখাচ্ছি।

এরপর প্রত্যেক দানে অভিজিৎ জিততে লাগল।

আর একবার গ্লাস ভরে দেবার সময় শেলি দত্ত আবার ইচ্ছে করে অভিজিতের আঙুল স্পর্শ করল। অভিজিতের চোখে চোখ রেখে ভুরু নাচাচ্ছে। অভিজিৎ এবারও বুঝতে পারল না। কী বলতে চায় মেয়েটা? কিছু একটা ব্যাপারে যেন নিজের করতে চাইছে অভিজিতকে। কোন ব্যাপার? অভিজিৎ তো দোষের কিছু করেনি।

অথবা মেয়েটা কি চাইছে, অভিজিতের সঙ্গে আলাদা কোনো সম্পর্ক পাতাতে? রতনলাল জেনে গেছে যে, সে কুমারী নয়-তাই কি সে অন্য খদ্দের ধরার আশায় অভিজিতের দিকে... অভিজিতের হাসি পেল।

শেলি বসেছে রতনলালের গা ঘেঁষে। সে নিজেও হুইস্কি খাচ্ছে। একটু একটু করে নেশা হয়েছে গেছে তার। বাড়ি ফিরে ছেলে-মেয়েদের কাছে সে কী কৈফিয়ত দেয়? সে অভিজিতের দিকে কীরকম যেন ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে।

পরের বারের তাস বাদলকে দিতে অনুরোধ করে অভিজিৎ বলল, আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি।

সঙ্গে সঙ্গে নিখিল উঠে এল তার পেছনে পেছনে। বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে চাপা গলায় বলল, ব্লাডি ফুল। এইভাবে তুই কাজ পাওয়ার আশা করছিস?

অভিজিৎ বলল, কেন? কিছু দোষ করেছি? বেশি মদ খাইনি তো?

মদ যত ইচ্ছে খা-না! কিন্তু তুই তাস খেলায় রতনলালকে হারাচ্ছিস কেন, ইডিয়েট! আমরা কি খেলা জানি না? হেরে গেলেই রতনলাল চটে যায়।

তুই ইচ্ছে করে হারছিস?

নিশ্চয়ই। তুই কেন বেশি কেরদানি দেখাতে যাচ্ছিস। রতনলালের মুখ থমথমে হয়ে গেছে, একটু পরেই সাংঘাতিক কান্ড করবে।

খেলায় তো হারজিৎ আছেই।

চুপ কর! কাজটা চাস কিনা বল?

এখন তো কিছুই হবে না। সেই ছ-মাস পর–তখন আর লাভ কী?

নিখিল পকেট থেকে অনেকগুলো এক-শো টাকার নোট বার করে বলল, এতে দু-হাজার টাকা আছে। তুই বসে বসে এই টাকাটা হার গিয়ে! পরে এর পাঁচগুণ টাকা ওর কাছ থেকে আদায় করা যাবে।

তা বলে ইচ্ছে করে এতগুলো টাকা হারব? ওর তো অনেক টাকা–এটুকু জিতেই বা লাভ কী?

জেতার আনন্দ। ও যে ভালো খেলে, এটা প্রমাণ করার আনন্দ! যা বলছি তাই কর। পরে এর পাঁচগুণ টাকা ওর কাছ থেকে আদায় করা যাবে। ও চটে গেলে মুশকিল।

দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ একটা সিগারেট ধরালো। তারপর নিখিলের একটা হাত চেপে ধরে বলল, শোন নিখিল, এইরকম জিনিস আমার কতদিন চালাতে হবে রে?

নিখিল বলল, তার মানে?

এইরকমভাবে রতনলালের তোষামোদ কতদিন ধরে করব? একটা কাজ পাওয়ার জন্য কতদিন ধরে আমাকে এইরকম করতে হবে?

কোনো ঠিক নেই। যতবার তোকে এখানে আসতে বলবে, ততবারই। ওকে খুশি রাখতে হবে সবসময়। ও একবার চটে গেলে এককথায় সব ক্যান্সেল করে দিতে পারে। এদের কাছে কনট্রাক্ট-ফনট্রাক্টের কোনো মূল্য নেই, সব মুখের কথায়-

ধোঁয়া ছেড়ে অভিজিৎ বলল, অর্থাৎ খেলায় আমরা আর সবাই হেরে যাওয়ার ভান করব, ও একলা জিতবে, এই তো?

হ্যাঁ! যদি কাজটা চাস

তাই হল, ফিরে এসে অভিজিৎ ইচ্ছে করে তাসগুলো নষ্ট করতে লাগল। ভালো তাস পেলেও প্যাক করে দেয়। নিখিল আর বাদল আবার অভিনয় করে মাঝে মাঝে বলছে, ইস, একটুর জন্যে এবার পেলাম না। রতনলালজি, আপনি এমন বুদ্ধি খাটালেন।

রতনলালের মুখের থমথমে ভাবটা কেটে গেছে। উৎসাহের চোটে সে প্রায়ই শেলি দত্তর ঊরুতে চাপড় মারছে। শেলির বুকের আঁচল ফেলা, সে-দিকে রতনলালের চোখ নেই, তার মনোযোগ শুধু ঊরুতে। অদ্ভুত স্বভাব!

অভিজিৎ এখন বেশি মদ খাচ্ছে। খেলায় যখন মাথা খাটানোর ব্যাপার নেই, তখন মদ খাওয়া ছাড়া আর কী করবার আছে? সব টাকাটা হেরে গেলেই সে উঠে পড়বে।

শেলি দত্তর দিকে বার বার তার চোখ যাচ্ছে। তার মনে হল, মেয়েটিকে এখানে মানায় না। ও কেন একটা সুন্দর সুখী সংসার পেল না? ঊরুটা ছড়িয়ে রতনলালের গায়ে বুক ঠেকিয়ে বসে আছে।

অভিজিৎ হঠাৎ যেন, একটা মাংসের গন্ধ পেল। পচা মাংস। শেলির গা থেকেই গন্ধটা বেরোচ্ছে। সেইসঙ্গে হুইস্কির গন্ধ আর সিগারেটের ধোঁয়া। রতনলালের বীভৎস হাসি...। মনে হল এটাই তো নরক।

তার চোখে আবার ভেসে উঠল সেই দৃশ্যটা। রূপনারায়ণ নদীর ধারে সবুজ ঘাসেভরা মাঠ। হু-হু করা হাওয়া। ওখানে আর ফেরা যাবে না? ওই ঘাসে গড়াগড়ি দিয়ে চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে...সুমিত্রা যদি রাজি হয়-ওখানে কিছু জমি কিনে এখানকার সব কিছু ছেড়ে

কী-খেলছেন না?

হ্যাঁ, খেলছি খেলছি।

সে বাদল আর নিখিলের মুখের দিকে তাকাল। ওরা বেশ মেনে নিয়েছে। এইরকমভাবে সবসময় একজন জিতবে, আর সবাই হারবে। তাকেও এটা মেনে নিতে হবে। দিনের পর দিন।

সে একটু জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, নিখিল, তা হলে ওই কাজটা আমি ঠিক পাব তো?

নিখিল বলল, হ্যাঁ পাবি! পাবি! ছ-মাস পরেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

অভিজিৎ প্রায় কেঁদে ওঠার মতন করে বলল, ছ-মাস যে বড্ড দেরি। অতদিন কি আমি টেনে নিয়ে যেতে পারব? যদি না পারি? আমার যে বড় দরকার? ছ-মাস ধরেই এই নরকে...

রতনলাল এক ধমক দিয়ে বলল, আরে মশাই খেলেন তো? শুধু কাম আর কাম। জানেন, সবসময় কাম আর রুপিয়া কামাবার ধান্দা করলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। মাঝে মাঝে একটু খেলা আর ফুর্তি দরকার, যাকে বলে রিলাকসেশান।

এই বলে সে শেলি দত্তর উরুতে আর একটা চাপড় বসাল।

আবার খেলা চলল। অভিজিতের কখন নেশা ধরে গেছে সে টের পায়নি, মাঝে মাঝে সে হা-হা করে হাসছে, আর সেই পাগলাটে হাসি। একবার সে ট্রায়ো তুলল। দশের ট্রায়ো। হেভি স্টেকসে ট্রায়ো ভোলা জুয়াড়িদের স্বপ্ন। কিন্তু অভিজিৎ তো জিততে পারবে না, সে জিতলে রতনলাল রেগে যাবে যে। হা-হা করে হেসে সে নিজের তাস প্যাক করে দিল।

একটু বাদে রতনলাল নিজেই কিন্তু কাজের কথা তুলল। সদ্য জেতা টাকাগুলো নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে সে বলল, তাহলে শিলং-এর ফ্যাক্টরি কবে থেকে চালু হচ্ছে, নিখিলজি?

নিখিল বলল, আপনি মুম্বাই থেকে ঘুরে আসুন, তারপর শিলং-এ গিয়ে নিজে সাইট দেখবেন। বেশ ভালো একটা বাড়ি পাওয়া গেছে, সঙ্গে গোডাউন আছে-তিন-চার মাসের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

বাদল বলল, কাঁচামালের সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটাও আমি পাকা করে ফেলেছি।

রতনলাল নিখিলকে বলল, ফ্যাক্টরির স্টাফের জন্যে বিজ্ঞাপন তো দিয়েছেন, আমার একটা কথা, বাঙালি নেবেন না। আপনি বাঙালি, আমি নিজেও ভি বাঙালিই হয়ে গেছি, তবু বলছি বাঙালি ছোকরা নিলে গন্ডগোল, ইউনিয়ন- ফিউনিয়ন, জানেন তো?

হঠাৎ অভিজিতের মাথায় রাগ চড়ে গেল। মাতালের রাগ বেশি সাংঘাতিক হয়। সে চোখ তুলে তাকাল। রতনলাল কথা বলতে বলতেই শেলি দত্তের উরু রীতিমতো খিমচে ধরে

আছে। লোকটা বাঙালি ছোকরাদের পছন্দ করে না। কিন্তু বাঙালি মেয়ে খুব ভালোবাসে। তাই আয়েসে চটকাচ্ছে। আর সহ্য করা যায় না।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, না।

সবাই চমকে উঠল।

নিখিল জিজ্ঞেস করল, কী বলছিস? তুই আর খেলবি না?

বাদল তাড়াতাড়ি বলল, আর খেলার দরকার নেই, উঠে পড়া যাক। চল অভিজিৎ, আমি তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।

অভিজিৎ আবার নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে বলল, না না, খেলা চলুক না। এই তো এখনও টাকা রয়েছে। আমাকে সব হারাতে হবে তো! সব না হেরে কী করে উঠব?

রতনলাল বলল, অত জোরে চেঁচাবেন না। বেশি চেল্লামেল্লি শুনলে আমার মাথা ধরে যায়।

অভিজিৎ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, চোপ!

নিখিল বলল, এই অভিজিৎ, কী করছিস। তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

অভিজিৎ রতনলালের দিকে ঝুঁকে এসে বলল, কেন আমি সবসময় হারব? আমরা কি জিততে জানি না?

রতনলাল বলল, খেলা শিখুন, তবে তো জিতবেন।

নিখিল বলল, ওঠ অভিজিত, উঠে পড়!

অভিজিৎ জড়ানো গলায় বলল, তুমি ওই মেয়েটার গায়ে হাত দিচ্ছ কেন? হাত সরাও শুয়ার কাঁহাকা

রতনলাল বলল, বেশি নেশা চড়ে গেছে। একে ভাগান!

হাত সরাও আগে!

শেলিই ঝংকার দিয়ে বলল, আপনি সে-কথা বলবার কে? আপনি চুপ করুন।

অভিজিৎ বলল, ছি: শেলি! তোমার দুটো ছেলে-মেয়ে আছে, কী ফুটফুটে তোমার মেয়েটা, ওরা ওদের মাকে সম্মান করবে না।

আপনি চুপ করুন! শেলি ধমক দিল।

রতনলাল এবার কড়া গলায় নিখিলকে বলল, এ নিখিলবাবু, একে ভাগান এক্ষুনি! এসব বাজেলোককে আমরা এখানে থাকতে দিই না! এদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

কী বললে মানিক?

আমি বাজেলোককে আমার এখানে থাকতে দিই না!

আমি বাজেলোক! হাত সরাও আগে–

বাড়ি যান, বাড়ি যান।

যাব, তোমাকেও নিয়ে যাব।

নিখিল এসে অভিজিতের হাত চেপে ধরতে গেল। অভিজিৎ এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল তাকে, তার গায়ে যেন এখন অসুরের মতন শক্তি। সে রতনলালের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তোমাকে এবার একটা নতুন খেলা দেখাব!

বাদল বলল, অভি, তুই নিজের সর্বনাশ করছিস।

অভিজিৎ বলল, সেটাই তো নতুন খেলা।

রতনলাল বলল, এসব হারামি লোককে কোনোদিন আমার এখানে আসতে দেবেন না। এই তু নিকাল হিয়াসে।

অভিজিৎ হা-হা করে হেসে বলল, যাচ্ছি!

অভিজিৎ হুইস্কির বোতলটার গলা ধরে তুলল। সবাই ভাবল, সে বুঝি ঢক ঢক করে চুমুক দিয়ে কাঁচা হুইস্কি খাবে। তার বদলে, বোতলটা ঘুরিয়ে শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে সে মারল রতনলালের মাথায়।

রতনলালের মুখ দিয়ে আর একটাও কথা বেরোল না। সে ঢলে পড়ে গেল শেলির বুকের ওপর। হুইস্কির সঙ্গে মিশে গেল তার রক্ত।

অভিজিৎ ভাঙা বোতলটা হাতে নিয়ে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। একমাত্র শেলি দত্তই তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল একবার, তারপর ফোঁপাতে লাগল। নিখিল আর বাদল একটাও শব্দ করল না। তাদের চোখ দুটো বিস্ফারিত।

অভিজিৎ বিশ্বাস করতে পারছে না। রতনলালকে মেরেছে? একেবারেই মরে গেছে লোকটা? অনেকখানি রক্ত এসে ছিটকে লেগেছে অভিজিতের জামায়। খুব নোংরা লাগছে।

নিখিল ঘোর ভেঙে বলল, এ কী করলি অভিজিৎ? এখন তোকে কে বাঁচাবে?

বাদল লাফিয়ে উঠে বলল, ডাক্তার? এক্ষুনি ডাক্তার ডাকতে হবে।

সে দরজার দিকে ছুটে যেতে নিখিল বলল, পালাচ্ছিস? বাদল তুই পালাচ্ছিস। এখন পালিয়ে গেলে আরও বোকামি হবে।

বাদল থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কই পালাচ্ছি না তো।

তাহলে ডাক্তারকে টেলিফোনে ডাক!

অভিজিৎ মুখটা ঘোরালো শেলি দত্তর দিকে। শেলি দত্ত তখনও রতনলালের মাথাটা চেপে ধরে আছে। কান্না থামিয়ে হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, মরে গেছে! আর রক্ত বেরোচ্ছে না- গা ঠাণ্ডা।

অভিজিৎ খুব শান্তভাবে বলল, ওকে তোমার কোল থেকে নামিয়ে দাও। ও আর তোমাকে টাকা দেবে না!

শেলি দত্ত বলল, আপনি নিজে তো ডুবলেনই, আমাদেরও ডোবালেন–

অভিজিৎ তবু শান্তভাবে বলল, তুমি বাড়ি যাও-বাড়িতে তোমার ছোটো ছেলে-মেয়ে আছে, তুমি কেন এই নোংরা জায়গায় থাকবে।

এই সময় নিখিল উঠে দাঁড়াতেই অভিজিৎ বলল, খবরদার কেউ আমার কাছে আসবে না!

মেঝেতে ছড়ানো রক্ত। সে-দিকে তাকিয়ে অভিজিতের গা গুলিয়ে উঠল। তাকে এখন পালাতে হবে। তাকে বাঁচতে হবে। সে আর এখানে থাকবে না-সে চলে যাবে নদীর ধারে সেই, সবুজ ঘাসেভরা জমিতে-খোলা হাওয়ায়

ভাঙা বোতলটা অস্ত্রের মতন তুলে ধরে অভিজিৎ বলল, খবরদার কেউ আমাকে ছোঁবে না।

নিখিল বলল, বাদল, ওকে ধর। ও পালালে আমাদের নামে দোষ পড়বে সব!

বাদল সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে উত্তর দিল, না না, অভিজিৎ, আমি তোকে ধরব না!

ভাঙা বোতলটা হাতে নিয়েই অভিজিৎ ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে এসে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল! এখন তার একটাই চিন্তা, তাকে বাঁচতে হবে। সে চলে যাবে নদীর ধারে সেই সবুজ মাঠে

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নীচে নেমে এসে সে ভাঙা বোতলটা ফেলে দিল। ছুটে রাস্তায় এসেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। তার জামায় রক্ত, কিন্তু রাত্তির বেলা এই ফাঁকা রাস্তায় কেউ দেখবে না।

অভিজিৎ ঠিক করল, এক্ষুনি বাড়ি ফিরে সুমিত্রাকে নিয়ে, এই ট্যাক্সিতেই আবার বেরিয়ে পড়বে। আজই তাকে চলে যেতে হবে। এই নরকে সে আর কোনোদিন ফিরবে না।

কিন্তু সুমিত্রা যদি এক্ষুনি যেতে না চায়? ব্যাংকের লকারে সুমিত্রার গয়না, ডায়িং ক্লিনিং-এ জামাকাপড়-সেসব ছেড়ে কি সুমিত্রা যাবে? সুমিত্রা যদি জিজ্ঞেস করে, কেন তার জামায় রক্ত, তার মুখে এত মদের গন্ধ-কেন সে পালাতে চায়? তা হলে সুমিত্রাকে কি সে সত্যি কথা বলবে, না মিথ্যে? সত্যি কথা সুমিত্রা সহ্য করতে পারবে? আর যদি মিথ্যে বলতে হয়

-ক-টা মিথ্যে? এক-শোটা, হাজারটা?

যে যদি বাড়ি পৌঁছে দেখে, তার আগেই পুলিশ এসে গেছে? বাদল আর নিখিলের টেলিফোনে।

অভিজিৎ তখন বুঝল, পৃথিবীতে সেরকম নদীর ধারে সবুজ নিরিবিলি প্রান্তর কোথাও নেই, যেখানে সে আর সুমিত্রা গিয়ে থাকতে পারে। না, সেরকম জায়গা আর কোথাও নেই। সে পালাতে পারবে না। তা ছাড়া কেনই-বা সে পালাবে? সে তো কোনো অন্যায় করেনি। সে একটা খেলায় জিতেছে মাত্র।

ঝুঁকে পড়ে সে, ট্যাক্সিওয়ালার ঘাড়ে একটা টোকা দিয়ে বলল, গাড়ি ঘুরিয়ে নিন। এখানকার থানায় চলুন।

থানায় ঢুকে ওসির টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সে খুব শান্ত গলায় বলল, আমি এইমাত্র একটি জানোয়ারকে খুন করে এসেছি।

থানায় লক আপে পরদিন সকালে যখন সুমিত্রা দেখা করতে এল, তখন অভিজিৎ তাকে খুব সহজ গলায় বলল, তুমি দুঃখ পেয়ো না। আমি এখন একদম ভালো হয়ে গেছি। বিশ্বাস করো, আমি সত্যি ভালো হয়ে গেছি।